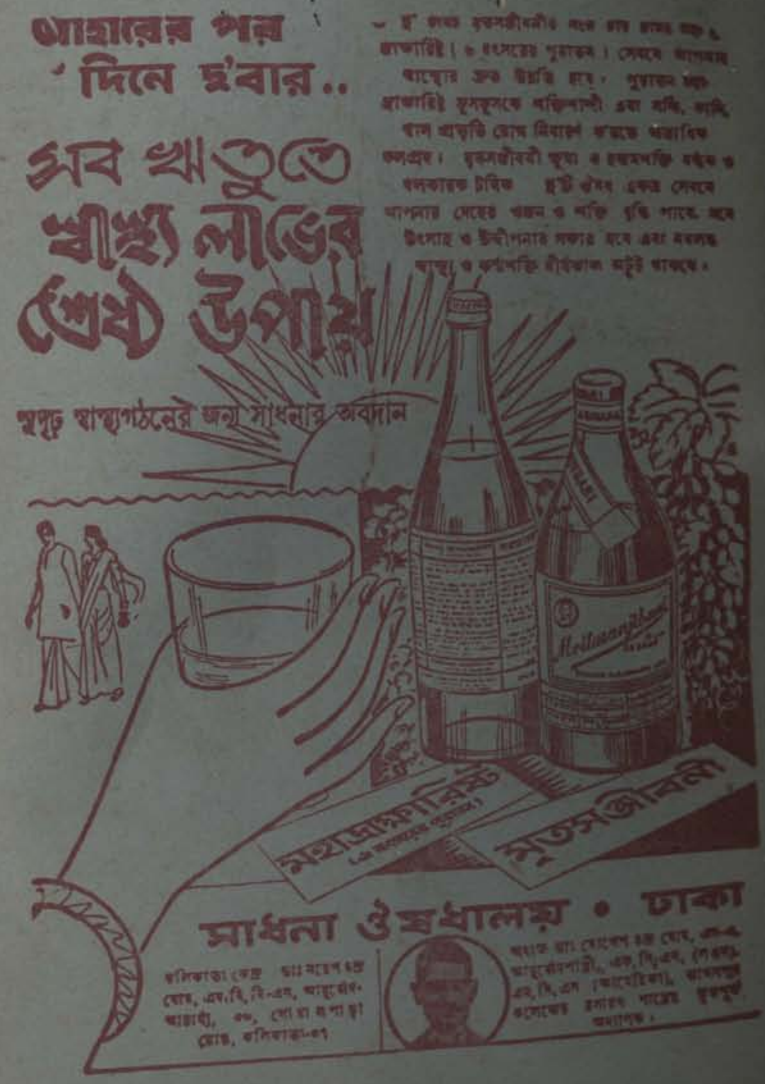
PARICHAYA :: DECEMBER 1963 :: Regd. No. C 3953



দাম : এক টাকা

পৌষ ১৩৭০

পরিচয়



পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৩৭০

সূচীপত্র

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতিটি এঁকেছেন নিখিলেশ দাস

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

...চয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

‘পরিচয়’-এর নিয়মাবলী

- পরিচয় মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণ মাসে বর্ষারম্ভ। কিন্তু যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষান্মাসিক ৫·৫০ নয়া পয়সা।
- টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য : ম্যানেজার, পরিচয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ও পরিচয়-এর প্রারম্ভ

ইংরাজী নববর্ষে পয়লা জানুয়ারিতে কলকাতায় আচার্য সত্যেন বোসের সপ্ততিতম জয়ন্তী পালিত হল যোগ্য সমারোহে। ‘পরিচয়’-এর পক্ষেও আজ আচার্য বোসকে অভিনন্দিত করার কথা। ‘পরিচয়’-এর জন্মকাল থেকেই তিনি ‘পরিচয়’ ও পরিচয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা ‘বিজ্ঞানের সঙ্কট’ পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার গৌরব বর্ধন করেছে। ঢাকা থেকে কলকাতায় এলে যোগ দিতেন ‘পরিচয়’-এর বৈঠকে। কিন্তু এ-সব কারণ ছাড়া একটি গূঢ় কারণ আছে যার খবর অবগত শুধু ‘পরিচয়’-এর প্রতিষ্ঠাতা-স্বরূপ জন তিনেক,—অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ, আমি ও নীরেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া অবগত আচার্য বোস নিজে।

কারণটি এই : সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যে-আলাপ হওয়ার ফলে পরিকল্পনা হল ‘পরিচয়’ প্রকাশের, সে আলাপ-সংযোগ করেন আচার্য বোস। ১৯৩০ অব্দে গ্রীষ্মকালে অপ্রত্যাশিতভাবে বোস এসে হাজির হলেন ডালহৌসী-স্কোয়ারে আমার আপিস ঘরে। সঙ্গে ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল দীর্ঘতনু কন্দর্পকান্তি এক যুবক। ইনি সুধীন্দ্রনাথ। বললেন, তোমার সঙ্গে সুধীন্দ্রর আলাপ করিয়ে দি। তোমার আপিসের পাশেই এঁর আপিস। দুজনেই তোমরা কবিগুরুর সঙ্গী হয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছ। সেবার যেমন তুমি গিয়েছিলে কবির সঙ্গে ফ্রান্সে, এবার তেমন ইনি গিয়েছিলেন অ্যামেরিকায়, ফিরেছেন সদ্য। দুজনেই তোমরা কবির কৃপা লাভ করেছ। তোমাদের আলাপ জমবে ভালো, মিল হবে খুব। বোস চলে গেলেন ঢাকায় ; আলাপ আমাদের জমল ভালোই।

প্রতিদিনই স্থধীন্দ্রর সঙ্গে আপিস ফেরত গিয়ে সন্ধ্যাটুকু কাটাতাম তাঁদের বাড়িতে, তাঁর বসবার ঘরে। যোগ দিতেন তাঁর স্ত্রী, জমে উঠত বিশ্রম্ভালাপ। পত্রিকা প্রকাশের কথা কিন্তু সন্থ ওঠে নি। উঠল বেশ কিছুকাল পরে, যেদিন প্রবাসীতে ছাপা আমার 'নৌকাডুবির প্লট' পড়ে শোনালাম তাঁকে। আগের দিন তিনি হঠাৎ 'অর্কেষ্ট্রা'র পাণ্ডুলিপি এনে পড়ে শুনিয়েছিলেন কয়েকটি কবিতা তা থেকে। কবিতাগুলি শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, বলেছিলাম তাঁকে। আমার লেখা শুনে কী মনে হল,—বললেন, বেশ হাত আপনার সমালোচনার। আস্থন একটা পত্রিকা বার করা যাক। সত্যেন্দ্রর কাছে শুনেছি আপনার বন্ধু নীরেন্দ্রর কথা, তাঁকে ডাকা চাই। আপনার অন্যান্য বন্ধুদেরও ডাকতে হবে, যাঁরা ছিলেন ভারত-ফরাসী মৈত্রী সংস্থার সভ্য। নীরেন্দ্রকে ডাকলাম, ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রবোধ বাগচী, স্থবোধ মুখোপাধ্যায়, হরিশ সিংহ, আমার দাদা পশুপতিবাবু—ইত্যাদি অনেককে ডেকে আনলাম। আলাপ করে দিলাম স্থধীন্দ্রর সঙ্গে। নীরেন্দ্রের প্রস্তাবে স্থির হল পত্রিকা হবে ত্রৈমাসিক, সারগর্ভ। থাকবে না তাতে বিজ্ঞাপন ও ছবি। গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও প্রবন্ধাদি আঙ্গিক ছাড়া তার বৈশিষ্ট্য হবে সমালোচনার গুরুত্ব ও পুস্তক-পরিচয়। পত্রিকা ভার নেবে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করে দেবার—বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান সকল ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে। নীরেন্দ্রই পত্রিকার নাম দিলেন 'পরিচয়'। স্থির হল সাপ্তাহিক একটা বৈঠক হবে 'পরিচয়'-এর, আর শুরুতে কবিগুরুর কাছে না গিয়ে প্রথম সংখ্যা বার হলে সেইটি নিয়ে যাওয়া হবে। এই সংখ্যার জন্য আচার্য বোস লিখে দিলেন তাঁর 'বিজ্ঞানের সঙ্কট'। যোগ দিলেন স্থশোভন সরকার, হিরণকুমার, চারু দত্ত, বিষ্ণু দে, শ্যামল ঘোষ ও নব আবিষ্কৃত পরিচয়-এর অন্য সব লেখক। স্থধীন্দ্রের পিতা বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহায্য করলেন নেপথ্য থেকে। ধারাবাহিক প্রকাশিত হল তাঁর 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ'। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ শ্রাবণে (ইং ১৯৩১) 'পরিচয়' প্রকাশিত হল। কবিগুরুর হাতে প্রথম সংখ্যাটি দিলে অত্যন্ত খুশি হয়ে লিখে দিলেন দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য "পত্রিকা" নামে এক চিঠি।

আচার্য বোসের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর পরিকল্পনা ও প্রকাশের যে সম্পর্ক তা সবিস্তারে বলা হল। জগতে অনেক কিছু ঘটে তাৎপর্যময় যার পিছনের কিছু খবর-খুঁজি পাওয়া যায় না। সেখানে কাজ হয় অলক্ষিতে। আমার

...গে স্থধীন্দ্রর আলাপ করিয়ে দেওয়া ও নীরেনের কথা তাঁকে বলা এই ...যোগের ফলে যে সম্ভাবনা সঞ্জীবিত হল তার প্রচ্ছন্ন ইসারা পেয়েছিলেন ...র বোস। পরে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারকল্পে ...তিষ্ঠা করেছেন 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকা ও 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। যেমন ...জ্ঞান ও বিশ্বরহস্যের বার্তা, তেমনি মানবিকতার বার্তা ও মাতৃভাষার বার্তা ...পৌছেছিল তাঁর কাছে সেই অলক্ষিত পথে যে পথ প্রশস্ত হয় তাঁদের কাছে ...রা পৌছান মানসলোকের উর্ধ্বস্তরে। সেই অলক্ষিত পথ দিয়ে 'পরিচয়'-এর ...ত্রা করিয়ে দিয়েছিলেন বোস। আমি জানি বলেই বললাম সেই কথা।

'পরিচয়'-এর বহুকাল আগে বোসেরই পরিকল্পনায় ও সম্পাদনে রচিত ...য়েছিল আর এক পত্রিকা। হাতে লেখা পত্রিকা, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি ...নীষা'। 'মনীষা' বার করা হয় আমাদের বাড়ি থেকে, ১৯১২ অব্দে। তখন ...ছিলেন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাতে যাঁরা ...লিখতেন তাঁরা হলেন, সত্যেন্দ্র নিজে, তারক দাস, রজনী পালিত, পূর্ণ সেন, ...থ মিত্র, ভূপালভূষণ, পশুপতি-দাদা, আমি ও আর কয়েকজন, বন্ধুরা মিলে। ...লা সরস্বতীর পুষ্পোদ্যানে ফুল ফোটাবার প্রথম প্রয়াস এটি সত্যেন্দ্রর। ...ন বা চার সংখ্যা বার হয়ে 'মনীষা' বন্ধ হয়ে যায়।

বোস-আইনস্টাইন সামষ্টিক সূত্র জগতে কীর্তিত। চল্লিশ বছর আগে সেটি ...য়ন করে আচার্য বোস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আইনস্টাইনের কাছে। ...ইনস্টাইন তাকে বিজ্ঞানাসরে স্বাগত জানিয়ে সমর্থিত করেন ও প্রচারিত ...রেন। বিশ্ব বিজ্ঞানীরা এই সূত্রকে বিপুল সম্মানিত করেছেন আইনস্টাইনের ...মের সঙ্গে বোসের নাম যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গীত করেছেন তাঁর ...শ্বপরিচয়' বোসকে। দেশবাসী ধন্য তাঁকে সম্বর্ধিত করে।

বত্রিশ বছর আগে, ১৯৩২ অব্দে, 'পরিচয়ে'র কার্তিক সংখ্যায় বোস ...ষ্টিক-সূত্রের সাধারণোপযোগী এক বিবরণ লিখেছিলাম। সম্বর্ধনা কমিটি ...ন স্মারক-গ্রন্থে সেটি পুনর্মুদ্রিত করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। যে তথ্যের ...র বোস-সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত সে হল এই যে গণিতে ব্যষ্টির আচরণের ...বিয়োগাদি করে সমষ্টিগত আচরণের সূত্র নিরূপিত হতে পারে না। ...ক্ষুদ্র একত্রিত হয়েই হয় বৃহৎ কিন্তু একত্রিত অবস্থায় বৃহতের জন্মায় এক ...ন সত্তা। বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞতা যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দ্বৈত। যে সূত্রে যে ...রে ব্যষ্টিকে ধরা যায় সে সূত্র ব্যবহারে সমষ্টিকে ধরা যায় না। সমষ্টির জন্য

চাই অন্য দৃষ্টি অন্য সমীকরণ-সূত্র। ব্যষ্টির আচরণের উদাহরণ ক্রিকেট বা বিলিয়ার্ড বল বা বুলেটের গতি, পতনশীল ঢিলের গতি, সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহদের গতিবিধি। সামষ্টিক আচরণের উদাহরণ গ্যাসের চাপ ও তাপ, উত্তাপের অপচয়—entropy। অসংবদ্ধ পথিক এক বস্তু, জনতার ভিড় আর এক। ভিড়ের চাপে পড়ে যিনি গেছেন ছিটকে, দমবন্ধ হয়ে তিনিই বুঝেছেন কতকটা সমষ্টি কী বস্তু। প্রয়াগ সঙ্গমে মেলায় শত শত লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন কেবল মাত্র ভিড়ের চাপে। গতিতে ব্যষ্টির আচরণসূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, গ্যালিলিও, নিউটন। সামষ্টিক সূত্রের উদ্ভাবক ক্লসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল। ক্লসিয়াস, ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের ক্ষেত্র ছিল গ্যাসের আচরণ। তেজ বা তাপ-বিকীরণ সংক্রান্ত সামষ্টিক সূত্রের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন লর্ড রেলে, বোলৎস্মান প্লাঙ্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। এই সূত্র প্রণয়নের প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শন করেন বোস। সংক্ষেপে এই হল বোস-সামষ্টিক সূত্রের বিবরণ। এই সূত্র বিনা বিজ্ঞানের এক দিকের পথ চলায় বিঘ্ন হচ্ছিল। তাই আইনস্টাইন বলেছিলেন বোস-সূত্র অগ্রসর করেছে বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানের পথচলায় পরে পরে চারদিকে জমে ওঠে বাধা-বিঘ্ন। তখন কোনো বিজ্ঞান-স্রষ্টা নতুন পন্থা অবলম্বনে বিপ্লব ঘটান। বিপ্লব সহসা সমূলে উচ্ছেদ করে বাধা-বিঘ্ন, পথ করে দেয় অগ্রসরের। দ্য-ব্রলী বলেছেন বিশ শতকে বিপুল বিপ্লব ঘটেছে বিজ্ঞানে। বোস-সূত্র সেই বিপ্লবে একাংশ গ্রহণ করেছে।

আলোক কণিকা 'ফোটন' অবলম্বনে বোস রচনা করেন এই সূত্র। ফোটনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন আইনস্টাইন। প্লাঙ্ক সিদ্ধান্ত করেন তেজ বা তাপ-বিকীরণও কণিকারূপী। উভয়েরই পরিচয় ছিল বিজ্ঞানে তরঙ্গরূপে, এখন থেকে তাদের কণিকা রূপও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হল। তেজ কণিকার নাম হল 'কোয়ান্টাম'। বোস-সমষ্টিসূত্র সিদ্ধকাম হল 'ফোটন' ও 'কোয়ান্টামে'র আচরণ-ব্যাখ্যায়। যে সূত্রের সন্ধান করছিলেন বোলৎস্মান, প্লাঙ্ক প্রভৃতি সে সূত্রের সুসিদ্ধ আকৃতি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু 'ফোটন', 'কোয়ান্টাম'-এর জন্য উদ্ভাবিত হলেও আইনস্টাইন বললেন বোস সমষ্টি-সূত্র সকল রকম কণিকা সমাবেশ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ সম্ভব। নিজে তিনি এ সূত্রকে প্রয়োগ করে দেখালেন ইলেকট্রণ কণিকার গ্যাস-সমাবেশে! বস্তুত বোস-সমষ্টিসূত্র বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করল। বোস-সমষ্টিসূত্র রচিত হবার পরে ফের্মি ও ডিরাক কর্তৃক আর একটি সমষ্টিসূত্র রচিত

রয়েছে। বিজ্ঞানাঙ্গনে ভিড় করে আছে অণু, পরাণু, 'ফোটন', 'কোয়ান্টাম', 'ইলেকট্রন' প্রোটন, নিউট্রন, নিউট্রিনো, বহুতর-মেসন আদি। দেখা গেছে এ-সব কণিকাদের একদল বোস-সূত্রের নিয়মাধীন আর একদল ফের্মি-ডিরাক সূত্রের। ডিরাক নাম দিয়েছেন এদের যথাক্রমে 'বোসন' ও 'ফের্মিয়ন'। যতদিন বিজ্ঞান থাকবে জগতে প্রতিষ্ঠিত ততদিন আচার্য বোসের নাম থাকবে কীর্তিত।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল বহু ও বিবিধকে ন্যূনতমের পর্যায়ে সীমিত করা। বিজ্ঞানে সূত্র ও সমীজ্ঞা (equation) রচিত হয় এই লক্ষ্য সাধনে। আইনস্টাইন মহাকর্ষ, আলোক, জড়, শক্তি, কাল, দেশ ইত্যাদিকে একটিমাত্র ক্ষেত্র-সমীজ্ঞায় (field equation) গেঁথেছিলেন। এই সমীজ্ঞার অপূর্ব সফলতার ফলে তিনি চেয়েছিলেন ঐ সঙ্গে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্তাকে একই ঐকিক ক্ষেত্র-সমীজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করতে। এই চেষ্টায় তিনি যে সমীজ্ঞায় উপনীত হন তার মধ্যে ছিল অনেকগুলি সমীজ্ঞা ও ধ্রুবাঙ্ক। এগুলির সংখ্যাধিক্য ও প্রতিকল্প সম্বন্ধে তিনি কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারেন নি। নিঃসংশয়কল্পে বোস নিজস্ব কয়েকটি সমীজ্ঞা রচনা করলেন, ও সেগুলি নোবেল লরিয়েট দ্য'-ব্রলী প্রকাশিত করলেন সাগ্রহে। সমীজ্ঞাগুলির সম্যক আলোচনা ও প্রমাণ অতীব দুরূহ। যোগ্য ও ইচ্ছুক আলোচনাকারীর অভাব একটা অন্তরায়। সুতরাং বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে এগুলি অসংশয়ে গৃহীত হওয়া সময়সাপেক্ষ। আপেক্ষিকতাবাদ গৃহীত হতে সময় লেগেছিল পনেরো বছর।

এখানে বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয় আমার। কিন্তু তাঁর কর্মোদ্যমের আর একটা দিক আছে যার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলা যেতে পারে এখানে। বিজ্ঞানের ধর্ম হল জড় ও প্রাণ-প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন, কিন্তু বিজ্ঞানের মর্ম হল প্রকৃতি-রহস্য ভেদ করে জড়ের ওপর মানুষের অধিকার বিস্তার, অজ্ঞান ও অভাব থেকে মুক্তিদান, বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা, সারা মানবজাতির মৈত্রী ও একাত্মতা সংঘটন, মহামানব-সমাজ প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান পুরোধারা ব্যাপৃত হন এই নিয়ে। আচার্য বোসকৃত 'জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠার অন্তর্লীন মর্মও এই। তাতেই হবে আমাদের কল্যাণ, আমাদের মৈত্রী স্থাপন—কেননা তা আনয়ন করবে বিজ্ঞানের প্রসার। সাম্প্রতিক কয়েকটি ভাষণে আচার্য বোস আলোচনা করেছেন এই কথার। জগতে মহাপুরুষরা ধর্মের পথে চালনা করে কল্যাণ,

মৈত্রী ও মুক্তির দ্বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, মানুষকে। কিন্তু ধর্মের প্রকরণ মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে পৃথক পৃথক মুক্তির সাধনায়। বিজ্ঞানের পথই প্রকৃষ্ট কল্যাণের, মৈত্রীর, মুক্তির পথ—সার্বভৌম মানবের সামষ্টিক কল্যাণ, সামষ্টিক মুক্তি। বিজ্ঞানই পারে মানুষের অভাব দূর করতে, মানুষের মধ্যে সমতা শান্তি আনতে, মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে। 'পরিচয়'ও যাত্রারম্ভে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সকল দেশের সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচয় অর্জন করে মহামানবের আদর্শে পৌঁছাতে। আচার্য বোসের সম্বর্ধনার দিনটি 'পরিচয়'-এর বিশেষ স্মরণীয় দিন হোক।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

কার্ল পপার-এর খণ্ডনবাদ

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীতে কার্ল পপার-এর সংশোধন-প্রচেষ্টা অনুধাবনযোগ্য। তিনি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং Inductive বা আরোহ পদ্ধতিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি নিজে Deductive বা অবরোহ পদ্ধতির অনুবর্তী। আরোহ পদ্ধতিতে তথ্য পর্যবেক্ষণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রকল্প (hypothesis) গ্রহণ। অবরোহ পদ্ধতিতে পূর্ব থেকেই প্রকল্প তৈরি হয়ে থাকে, সেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় তথ্য পর্যবেক্ষণের দ্বারা। সুতরাং প্রকল্প হচ্ছে পূর্ববর্তী ক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ পরবর্তী ক্রিয়া। গবেষণা-ক্ষেত্রে যাবতীয় ঘটনাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি না, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্বাচন করি। নির্বাচন সম্ভব হয় কিরূপে? কোনো একটা প্রকল্পকে আমরা পরীক্ষা করতে চাই, সেইজন্য সীমিত ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঘটনাগুলিকে নিরীক্ষণ করি। কাজে কাজেই একথা ধরে নিতে হবে যে প্রকল্প ব্যতীত পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। প্রকল্প থেকেই বৈজ্ঞানিকের যাত্রা হয় শুরু। প্রকল্পের পরীক্ষা (test) চলে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে।

কার্ল পপার-এর মোটামুটি বক্তব্যগুলি এইরূপ :

(ক) "Induction, i. e., inference based on many observations is a myth. …the actual procedure of science is to operate with conjectures."

অর্থাৎ, Induction বা আরোহ-পদ্ধতি একটা বাজে কথা মাত্র। অনেকগুলি ঘটনা দেখলাম, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম—এ-জাতীয় আরোহ-প্রণালী কখনও অনুসরণ করেন না বৈজ্ঞানিক। তাঁর অবলম্বন হচ্ছে প্রকল্প। তিনি প্রকল্পের সাহায্যে কাজ চালিয়ে যান।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে তফাৎকরণ বা demarcation হচ্ছে প্রাথমিক সমস্যা। কি করে উভয়ের মধ্যে তফাৎ করতে হবে?

প্রচলিত মতে Verifiability বা প্রমাণ-যোগ্যতা হচ্ছে তফাৎকরণের সূত্র। বৈজ্ঞানিক বচনগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণের যোগ্য। অবৈজ্ঞানিক বচনগুলি প্রমাণের অযোগ্য। বৈজ্ঞানিক বচনগুলি অর্থপূর্ণ বা meaningful বাক্য। অবৈজ্ঞানিক বচনগুলি অর্থহীন বা meaningless বাক্য। এই মতকে বলা চলতে পারে Verificationism বা প্রমাণবাদ। Inductionist বা আরোহবাদীরা হচ্ছেন সাধারণত প্রমাণবাদী। তাঁরা প্রমাণের উপর জোর দেন। প্রথমে পর্যবেক্ষণ, তারপর প্রকল্প গ্রহণ, তারপর প্রমাণ-প্রক্রিয়া—এই জাতীয় পর্যায়ক্রম তাঁরা অনুসরণ করেন।

পপার প্রমাণবাদকে পদ্ধতি হিসেবে আক্রমণ করেছেন। সত্য-নির্ণয় বা অর্থ (meaning) উদ্‌ঘাটন প্রকৃত সমস্যা নয়। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের লক্ষণ হচ্ছে falsifiability বা খণ্ডনযোগ্যতা। বৈজ্ঞানিক উক্তি হবে খণ্ডন-যোগ্য।

"Falsifiability or refutability is a criterion of the scientific status of a theory."

অর্থাৎ, যে কোনো প্রকল্পই খণ্ডনযোগ্য নয়। যে প্রকল্প খণ্ডনযোগ্য তাকেই শুধু বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেওয়া চলে।

এই মত Falsificationism বা খণ্ডনবাদ-রূপে বিবেচিত হতে পারে। এই পদ্ধতি হচ্ছে negative বা নেতিমূলক আকৃতিযুক্ত। অপর পক্ষে প্রমাণবাদ হচ্ছে positive বা স্বীকৃতিমূলক পদ্ধতি।

পপার-এর মতে পরীক্ষাকার্য হচ্ছে খণ্ডনমূলক। একটা প্রকল্প উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে পরীক্ষা (test) করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তাকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু খণ্ডন করা যাচ্ছে না। তখন তা পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত (corroborated) সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হবে।

নেতিমূলক রাস্তা দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের পরীক্ষণকার্য চলে।

"Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it."

অর্থাৎ, যথার্থ পরীক্ষণকার্য মানেই খণ্ডনের চেষ্টা।

যে উক্তিকে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করেও খণ্ডন করা গেল না তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বাড়ল।

এ-প্রসঙ্গে পপার-প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা :

মার্কসীয় ইতিহাসবাদের একটা অংশে প্রতিপাদ্য হয়েছে বিপ্লববাদ। আগামী বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণী খণ্ডিত হয়েছে। খণ্ডিত

প্রকল্প পরিত্যাজ্য। কিন্তু মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বর্জিত হয় নি। সুতরাং মার্কসীয় প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, বিশেষত Id বা অবচেতন-প্রবৃত্তি বিষয়ক প্রকল্প খণ্ডনের যোগ্য নয়, অর্থাৎ, পরীক্ষণের যোগ্য নয়। সুতরাং এর কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই।

অ্যাড্‌লার-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব, হীনমন্যতার মনস্তত্ত্ব পরীক্ষণযোগ্য বা খণ্ডনযোগ্য নয়। সুতরাং এর বৈজ্ঞানিক মূল্য অস্বীকার্য।

কিন্তু আইনস্টাইন-এর মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ছিল খণ্ডনযোগ্য। ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণ ঘটল। গ্রহণের ফলাফল লক্ষিত হল। এই পর্যবেক্ষণের ফলে আইনস্টাইন-এর প্রকল্প খণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু খণ্ডিত হল না বলেই উচ্চতর বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় উন্নীত হল।

বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মধ্যে থাকে risk বা সঙ্কটের সম্ভাবনা। এ-জাতীয় প্রকল্প খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যদি খণ্ডিত না হয়, তবেই এর বৈজ্ঞানিক মূল্য বাড়বে। খণ্ডনকে এড়িয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নয়। তাঁর উক্তির খণ্ডনের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকেন।

(গ) পপার বলেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে trial and error, অর্থাৎ পরীক্ষণ এবং ভ্রমের ভিতর দিয়ে অগ্রগমন। বৈজ্ঞানিক ভুল করেন। তাঁর ভুল ধরা পড়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে। ভুল করবার সাহস না থাকলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলতে পারে না। যে প্রকল্প খণ্ডিত হয় তা ভ্রান্ত।

বৈজ্ঞানিকের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ-প্রসূত নয়। পরন্তু conjecture বা আন্দাজ মাত্র। সাহসিকতার সঙ্গে আন্দাজটি উপস্থাপিত হল। খণ্ডিত হল পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে। পরিত্যক্ত হল। খণ্ডিত না হলে সমর্থনযোগ্য হল। অর্থাৎ, প্রকল্পের পরে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের সহায়তায় প্রকল্প তৈরি হয় না। বৈজ্ঞানিক কখনও পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করেন না, একটি প্রকল্প মাথায় রেখে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান।

স্বভাবত প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের প্রত্যাশা করি আমরা। জৈব প্রয়োজনে এই নিয়মের প্রত্যাশা। Point of view বা বা দৃষ্টিভঙ্গী, problem বা সমস্যা থেকে এই প্রত্যাশা। ক্ষুধার্ত পশু, পলায়ন-রত পশু, নবজাত শিশুর আচরণে এই প্রত্যাশা অভিব্যক্ত। বিজ্ঞানীর মধ্যেও আমরা দেখি নিয়মের প্রত্যাশা, যার মূলে রয়েছে বিশেষ ধরনের সমস্যাবোধ।

প্রকৃতির ক্রোড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না নিয়মের জ্ঞান। ঘটনা দেখে নিয়মের জ্ঞান হয় না। স্বকল্পিত নিয়মকে মানুষ যাচাই করে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে।

এক্ষেত্রে ক্যান্ট-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে মানবীয় বুদ্ধি প্রকৃতির উপর নিয়ম চাপিয়ে দেয়। এই নিয়ম হচ্ছে apriori বা প্রাক্-প্রত্যক্ষ সংযোগ-সূত্র, সুতরাং নিশ্চিতরূপে সত্য। এর সহায়তায় প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট অবিন্যস্ত ঘটনাগুলিকে সংযোজিত করা হয়। পপার ক্যান্ট-এর উক্তিকে সংশোধন করে বলতে চান যে মানুষ স্ব-কল্পিত নিয়মকে প্রত্যাশা করে প্রকৃতির মধ্যে। এই প্রত্যাশা প্রতি পদে পদে বাধা পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। সুতরাং অ্যাপ্রায়রাই হলেও নিয়মের প্রত্যাশা অভ্রান্ত নয়। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প অনবরত খণ্ডিত হতে থাকে, পরিত্যক্ত বা সংশোধিত হতে থাকে।

পপার বলেছেন যে dogmatic attitude বা অবিচারী প্রাক্-বৈজ্ঞানিক প্রবণতা হচ্ছে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার দিকে। Critical বা বিচারী বৈজ্ঞানিক প্রবণতা হচ্ছে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে বর্জনের দিকে। ক্যান্ট-এর বিচারবাদ (criticism) থেকে স্বতন্ত্র পথচারী পপার-এর বিচারবাদ।

ক্যান্ট-এর মতে সত্যতা (validity) অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়, পরন্তু অ্যাপ্রায়রাই বা প্রাক্-প্রত্যক্ষ। মানস থেকে নিয়মের জন্ম, তাই তার নিশ্চয়তা। পপার-মতে প্রকল্পমাত্রেই হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই, কিন্তু তাই বলে নিশ্চিত নয়। তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি অনুসারে সর্বপ্রকার নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পই হচ্ছে আন্দাজমাত্র, এমনকি যখন আমরা এই নিয়মগুলির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ভ্রান্তি প্রকট হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় কোনো থিওরী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় কিংবা সমর্থিত হয়। এই সমর্থনের বা corroboration-এর মাত্রা কম বা বেশি হতে পারে। কোনো প্রকল্প বাস্তবের দ্বারা অধিক সমর্থিত হয়, কোনোটি হয়তো কম সমর্থিত হয়। যে থিওরী পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে খণ্ডিত (falsified) হয় না তার সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা দাবি করা যায় না। নিশ্চয়তা বা সম্ভাব্যতা (probability) বিজ্ঞানের লক্ষ্য হতে পারে না। কম সম্ভাব্য থিওরীও লালিত হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদি তার মধ্যে ভালো ব্যাখ্যা-সূত্র থাকে।

"Although we saek theories with a high degree of corroboration, as scientists we do not seek highly probable theories but explanations."

অর্থাৎ, আমরা এমন থিওরী খুঁজি যা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়। সেই থিওরী কম সম্ভাব্য হয়েও ভালো ব্যাখ্যা-সূত্র হতে পারে।

পপার-এর চিন্তা-প্রণালীতে কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। যথা :

(১) Apriorism বা প্রাক্-প্রত্যক্ষবাদ ;.

(২) Induction বা আরোহ পদ্ধতির পরিবর্তে Deduction বা অবরোহ পদ্ধতিকে স্বীকার ;

(৩) Hypothesis বা প্রকল্পের উর্ধ্বে বিজ্ঞান উঠতে পারে না এই মতের প্রতিপাদন ;

(৪) Falsificationism বা খণ্ডনবাদ ,

(৫) Corroboration বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থনকে বিজ্ঞানের লক্ষ্যরূপে প্রতিপাদন।

[pp. 155—187, British Philosophy in Mid-century, Philosophy of Science, K. R. Popper, 1957]

পপার-এর চিন্তাধারায় অভিনবত্ব লক্ষণীয়। জ্ঞান-বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নন কিংবা সম্ভাবনাবাদীও নন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্যান্ট ছিলেন আশাবাদী, যদিও অধিবিদ্যাকে নস্যাৎ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আশাবাদ Inductionist বা আরোহবাদীরা অনেক সময়েই পোষণ করে থাকেন। তাই হচ্ছে পপার-এর আক্রমণস্থল। অবিচারী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকেও আঁকড়ে থাকে। এইরূপ দৃষ্টিকোণকে পপার আঘাত হেনেছেন। তাঁর মতে সর্ববিধ প্রকল্পই আন্দাজমাত্র। কোনোটি অভিজ্ঞতার দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, কোনোটি খণ্ডিত হয় নি। খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার মনোবৃত্তি অবৈজ্ঞানিক। পপার-এর বিচারবাদ বহুলাংশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ।

পপার বলেছেন যে প্রকল্পের আদি উৎস হচ্ছে মানসিক প্রত্যাশা। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে প্রকল্প উদ্ভূত হয় না। প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্তী এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা পাই না। এই জ্ঞান সহজাত বিশ্বাস-প্রসূত, সুতরাং অ্যাপ্রায়রাই। নিয়মের প্রত্যাশা থেকে প্রকল্পের জন্ম। সেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা।

প্রকল্প (hypothesis) হচ্ছে ঘটনা বা fact-এর ব্যাখ্যা-সূত্র। ঘটনা বা তথ্য সম্মুখে নেই, সেরূপ ক্ষেত্রে প্রকল্প তৈরি হয় না। ঘটনা মনের উপর কাজ করে, তার প্রতিক্রিয়ায় মন ব্যাখ্যা-সূত্র খুঁজতে থাকে। সেই ব্যাখ্যা-সূত্রই হচ্ছে প্রকল্প। তথ্য পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উদ্ভব হতে পারে না। পপার বলেছেন যে পর্যবেক্ষণের পূর্বেই প্রকল্প তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রকল্প হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই মানসিক ক্রিয়া। এই মতকে মেনে নেওয়া কঠিন।

নিয়মের প্রত্যাশা হচ্ছে সহজাত বা অ্যাপ্রায়রাই। পপার-এর এই উক্তি সহজবোধ্য। নিয়মের প্রত্যাশা আছে বলেই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প গঠনে প্রবৃত্ত হই আমরা। কিন্তু নিয়মের প্রত্যাশা এবং তথ্যের ব্যাখ্যা-সূত্র হিসেবে প্রকল্প গঠন এক জিনিস নয়। তথ্য পর্যবেক্ষণের পরেই প্রকল্প গঠিত হয় সেই তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্য।

ইতর জীবের মধ্যে, এমনকি প্রাথমিক এককোষী প্রাণী অ্যামিবার মধ্যে অচেতন নিয়মের প্রত্যাশা লক্ষিত হয়। অ্যামিবা খাদ্য ও অখাদ্যের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে। এই শ্রেণীকরণ ঠিক অ্যাপ্রায়রাই ব্যাপার নয়। খাদ্য ও অখাদ্যের শ্রেণীকরণ সম্ভব হয় পরীক্ষণের ভিতর দিয়ে।

মানবীয় শিশুর নিকটে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে কোনো সীমারেখা থাকে না। তার ভক্ষণ-প্রবৃত্তি সহজাত বা অ্যাপ্রায়রাই ব্যাপার। কিন্তু সে খাদ্য ও অখাদ্যের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করতে শেখে পরীক্ষণের ভিতর দিয়ে। তার খাদ্য-সম্বন্ধীয় ধারণা অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী বা অ্যাপ্রায়রাই নয়।

জন্মান্ধ ব্যক্তি বর্ণের শ্রেণীবিভাগ করতে অক্ষম। জন্ম-বধির ব্যক্তি শব্দ বিষয়ে কোনো ধারণা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও জেব্রা দেখে নি বা কারও কাছে জেব্রার কথা শোনে নি তার পক্ষে জেব্রার ধারণা করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে জাতি-ধারণা বা class-idea গঠনের প্রবণতা মনোগত বা অ্যাপ্রায়রাই বৃত্তি। গো-ব্যক্তির চেহারায় গো-জাতি প্রতিভাত নয়। গো-ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। গো-জাতি মানসিক কল্পনামাত্র। কিন্তু গো-ব্যক্তি না দেখলে গো-জাতির ধারণা জন্মায় না। গো-ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করবার জন্য গো-জাতির ধারণা আবশ্যক। সেই ধারণা গঠিত হয় গো-ব্যক্তি পর্যবেক্ষণের পর, যদিও এই ধারণা গঠনের প্রবণতা একান্তই মনোগত।

Idea বা ধারণামাত্রই এক হিসাবে মানসিক। বস্তুজগতে শুধুমাত্র ব্যক্তির

অস্তিত্ব আছে। Society—সমাজ, State—রাষ্ট্র, Nation—আঞ্চলিক জাতি—প্রভৃতিও হচ্ছে মানসিক ধারণা। ব্যক্তি মানুষদের বিশেষ সমাবেশকে সমাজ নাম দেওয়া হয়েছে, ভিন্ন ধরনের সমাবেশকে রাষ্ট্র বলা হয় এবং আর একজাতীয় সমাবেশকে নেশন-রূপে আখ্যাত করা হয়। চোখে দেখার জিনিস নয় এই ধারণাগুলি। আমরা শুধু ব্যক্তি মানুষকেই চোখে দেখি। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের বিশেষ সমাবেশ-গত আচরণ লক্ষ্য করেই এই ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং এই ধারণাগুলির অ্যাপ্রায়রাই বা মানসিক উৎপত্তি ধরে নেওয়া যায় না। বস্তুগত পর্যবেক্ষণের প্রভাবে ধারণাগুলি জন্মাতে থাকে আমাদের মনের ভিতরে, যেহেতু জৈবগত প্রয়োজনে ধারণা গঠনের অ্যাপ্রায়রাই প্রবণতা রয়েছে আমাদের।

পৃথিবীতে কত শত জাতি বা species-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে আমাদের। আসলে চোখে দেখি আমরা ব্যক্তিকে। জাতিকে চোখে দেখি না। ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে জাতির ধারণা গঠনে প্রবৃত্ত হই, যেহেতু অসংখ্য ব্যক্তিকে স্মরণে রাখা সম্ভব নয়। জৈব প্রয়োজনে চিন্তা-সংক্ষেপ না হলে চলে না। তাই বিভিন্ন জাতি-ধারণার খোপে খোপে ব্যক্তিগুলিকে সাজাই কল্পনার সহায়তায়। ব্যক্তিকে দেখেই জাতি-ধারণা আবশ্যক হয়। জাতি-ধারণাগুলি পর্যবেক্ষণের ফল। জন্মকালে এগুলি আমাদের মাথার মধ্যে ছিল না।

প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে প্রকল্প গঠনের প্রবণতাও হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই বা মনোগত। প্রকৃতির মধ্যে ঘটমান ঘটনা চোখে দেখা যায়, দুই ঘটনার মধ্যে ক্রমিকতাও চোখে দেখি আমরা। কিন্তু কার্য-কারণ নিয়ম চোখে দেখার জিনিস নয়। দৃষ্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য নিয়মের কল্পনা করি আমরা জৈব প্রয়োজনে। নিয়মের ধারণা আমাদের জীবনধারণকে সহজতর করে। কিন্তু বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবার পরই তার ব্যাখ্যা-সূত্র হিসেবে নিয়মের প্রকল্প আবশ্যক হয়। আগে থেকেই এই ব্যাখ্যাসূত্র মাথার মধ্যে থাকে না। সুতরাং প্রকল্পের উদ্ভব পর্যবেক্ষণ-জনিত। অর্থাৎ কোনো প্রকল্পই অ্যাপ্রায়রাই নয়।

প্রকল্পের উপকরণ পর্যবেক্ষণ থেকেই আহৃত হয়।

(১) আপেল ফলের মাটিতে পতন লক্ষ্য করবার পর পতন-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এই সমস্যার কল্পিত সমাধান হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ নামক ব্যাখ্যা-সূত্র।

(২) একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাষ্পের কার্য লক্ষিত হওয়ার পর বাষ্পশক্তি সংক্রান্ত প্রকল্প গঠিত হয়েছিল। বাষ্পশক্তির কার্যকরী প্রয়োগ-সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিল সমসাময়িক শিল্পগত প্রয়োজনবোধ।

(৩) যিনি আলোক দেখেছেন এবং স্বল্প সূর্যালোকে ধাবমান অণু সকল লক্ষ্য করেছেন তাঁর পক্ষেই আলোকের অণু (corpuscle) কল্পনা করা সম্ভব। জল-তরঙ্গ দেখে আলোক-তরঙ্গ কল্পনা সম্ভব হয়েছে। আবার দুই কল্পনা এসে মিশেছে আলোক-তরঙ্গের অণুবৎ আচরণ সংক্রান্ত আধুনিক প্রকল্পের মধ্যে।

Liquid বা স্থূল তরল পদার্থ দেখে fluid বা সূক্ষ্ম তরল-পদার্থের কল্পনা সম্ভব হয়েছে। যথা, বায়ুকে ফ্লুইড-রূপে কল্পনা।

কোনো কোনো প্রকল্প সোজাসুজি পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। কিন্তু এগুলির পশ্চাতে বাহ্য প্রভাব নেই একথা বলা যায় না। সামাজিক প্রভাব, সমসাময়িক জ্ঞানের স্তর, প্রশিক্ষণের প্রভাব প্রকল্প গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব সম্ভব হয়েছে আধুনিক গাণিতিক জ্ঞানের অগ্রগতির দরুণ। মধ্যযুগীয় জ্ঞানের অবস্থায় এই তত্ত্ব উদ্‌ভাবন সম্ভব ছিল না।

পপার প্রকল্প গঠনের মূলীভূত সমস্যা বা দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলেছেন। এই সমস্যা-বোধ সর্বদাই সমকালীন জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অ্যালকেমির যুগে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি দেখা দেয় নি। বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ যে লাভ করে নি তার মস্তিষ্ক ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতির ব্যাপারে কখনও বিব্রত হবে না। আদিম আন্দামানবাসীর নিকটে আণবিক সমস্যা নিরর্থক।

সমস্যা-বোধ যুগভেদে ভিন্ন হয়। প্রাকৃতিক উৎপাত প্রাচীনকালের মানুষের নিকটে একটি সমস্যা-রূপে গণ্য ছিল, একালেও সমস্যা-রূপে বিবেচিত। কিন্তু সেকালের ব্যাখ্যা-সূত্র ছিল দেবতার প্রভাব এবং সমাধান ছিল তুকতাক বা ম্যাজিক। প্রাকৃতিক উৎপাত দৈব প্রভাবের ফল, দৈব প্রভাবকে শান্ত করবার জন্য তুকতাকের ব্যবস্থা। যেমন সমস্যা-বোধ, ঠিক তেমনি সমাধানের দাওয়াই। একালের সমস্যা-বোধ এবং সমাধান একেবারেই আলাদা।

সমস্যা-চেতনায় ও প্রকল্প গঠনে সমসাময়িক জ্ঞানের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। একালের কোনো বিজ্ঞানী গ্রহগত প্রভাব এবং তাবিজের সমাধান উপস্থাপিত করলে তাঁর সহকর্মীদের হাস্যরস সৃষ্টি করবেন। অ্যাস্ট্রলজি বা ফলিত জ্যোতিষ

এখনও টিকে আছে ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনার জন্য, কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণাগারে এর কোনো কদর নেই। ফলিত জ্যোতিষের প্রকল্প যথার্থভাবে প্রমাণযোগ্যও নয়, খণ্ডনযোগ্যও নয়। সমসাময়িক জ্ঞানের অবস্থায় এর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে অনিচ্ছুক আধুনিক বিজ্ঞানী।

সুতরাং খেয়াল ও খুশিমতো প্রকল্পের প্রস্তাব বিজ্ঞান-জগতের আচরণ-বহির্ভূত। কোনো প্রকল্পই একেবারে মনগড়া বা অ্যাপ্রায়রাই নয়, পরন্তু সমসাময়িক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত। এই বাহ্যিক প্রভাবকে পপার উপেক্ষা করেছেন।

যে কোনো প্রকল্প বা ব্যাখ্যা-সূত্র এক দিক দিয়ে ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি, আর এক দিক দিয়ে social product বা সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক চাহিদা বিশেষভাবে প্রকল্প গঠনকে প্রভাবিত করে। পূর্বকালের ঐশ সৃষ্টির প্রকল্প কিংবা একালের সৌরজগতের বিবর্তন-প্রকল্প প্রমাণযোগ্য বা খণ্ডনযোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমানের পক্ষপাত হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকল্পের উপর।

পপারের প্রস্তাবিত খণ্ডনবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা আনতে চেয়েছে। তাঁর মতে প্রমাণবাদ অবৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে প্রশ্রয় দান করে। কিন্তু কিছু কিছু প্রকল্প খণ্ডনযোগ্য না হয়েও লালিত হয়ে এসেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। যথা:

(১) ইথারের প্রকল্প;

(২) Instinct বা সহজাত বৃত্তি সংক্রান্ত প্রকল্প;

(৩) Unconscious বা অবচেতন সংক্রান্ত প্রকল্প;

(৪) বংশধারা ব্যাখ্যার জন্য gene বা বংশবীজ প্রকল্প ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত আচরণকে ব্যাখ্যার জন্য পূর্ব জন্মের সংস্কার-প্রকল্প এককালে আদৃত হত। বর্তমানে পরিবেশ ও বংশধারার কথা বলা হয়। সেকালও নেই, সেই মানুষের মনও নেই। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা-সূত্র বদলাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বদলাবে। আসলে আমাদের মনটা হচ্ছে বহুলাংশে social product বা সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক প্রভাবের দিকটা দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বিবেচনীয় হওয়া উচিত।

পপার-এর আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবিচারী মনোবৃত্তি।

মনোবিজ্ঞানে এবং সমাজবিজ্ঞানে অবিচারী মনোবৃত্তি অনেক সময়ে প্রকট

হয়েছে। মর্গানবাদের যে অংশগুলি খণ্ডিত হয়েছে সেগুলির প্রতি এখনও অনুরাগ প্রদর্শিত হয়।

ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব এক সময়ে কল্পিত হয়েছিল। এই প্রকল্প খণ্ডিত হয়েও পরিত্যক্ত হয় নি।

মাতৃকাচর্যার তাৎপর্য হচ্ছে উর্বরতা-মূলক ম্যাজিক। এর সঙ্গে মাতৃশাসন বা মেট্রিয়ার্কির কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এখনও অনেকে মাতৃকাচর্যাকে যুক্ত করেন মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে। বঙ্গদেশীয় শক্তিপূজার মূলে আদিম মাতৃতন্ত্রের প্রভাব এখনও অনুমিত হয়।

ইতিহাসের নৃবংশীয় ব্যাখ্যা বা Racial interpretation of history খণ্ডিত হয়েছে। বিশুদ্ধ নৃবংশ কোথাও দৃষ্ট হয় না। আধুনিক গোষ্ঠীগুলিতে নৃবংশীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এখনও নৃবংশীয় ব্যাখ্যা-সূত্র কোনো কোনো মহলে সমাদৃত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জট-মোচনের ব্যাপারে পপার-এর বিচারবাদ কার্যকরী হতে পারে।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

একটি শিশিরবিন্দু

চোখ চেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম সজ্ঞান পরিচয় শহরে—জীবিকার পাটে।

নোয়াখালির বাসাবাড়িতে সে পরিচয়ে বাধা ছিল না। গৃহপরিধি আত্মীয়স্বজন আমাদের কম নয়। শিশুদের পরিচয়-পরিধিও তাই খর্বিত হত না। তার ওপর শহরটা ছিল নামেই সদর, আসলে প্রায় গ্রাম। শহরবাসীরা আবার অনেকেই ঢাকা-ফরিদপুরের জীবিকান্বেষী, সাধারণভাবে তাদের সে অঞ্চলে পরিচয় 'বিক্রমপুরী'। সত্যই, শহরটা যেন বিক্রমপুরেরই উপনিবেশ। বিলিতী ঔপনিবেশিকতাই এই নেটিব সংস্করণটিও নিজের প্রয়োজনে গড়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের তল্পীদার করে নিয়েছিল উত্তর ভারতে শাসন ও শোষণ চালাতে। সেই সূত্রে সে ভদ্রলোকেরাও সেখানে উপনিবেশ গড়েন, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, শিক্ষাদীক্ষা ও দশটা সৎকর্মে বাঙালীই হয় পশ্চিমের অনেক শহরে অগ্রণী। কিন্তু সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যেতে চান নি, নিজেদের রেখেছেন স্বতন্ত্র করে—'বাঙালীবাবু' যেন একধাপ উঁচুতে। 'বিক্রমপুরী'দেরও এ শহরে লাভ হয়েছিল ছোট পরিসরে সেরূপ সুযোগ, সেরূপ প্রতিষ্ঠা, সেরূপ প্রাধান্য; আর ছিল সেরূপ স্বাতন্ত্র্য। অবস্থার অসংগতিটা মৌলিক।

ব্যাপারটা মূলত হাস্যকর—পেটি বুর্জোয়ার কর্তাগিরি। ইংরেজ দেশের মালিক, সে 'দেশের মানুষ' নয়। সাহেবের লাথি সবাই তাই সহ্য করে উপায় নেই বলে—কিন্তু কেরানির কাণমলার অধিকার সহ্য করবে কোন্ ভয়ে? এই হাস্যকর 'বড়বাবু'পনা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় হয়েও ওঠে—বাঙলার বাইরে সর্বত্রই আজ তা দেখছি। নোয়াখালি শহরে 'বিক্রমপুরী'দের ভাগ্যেও সে ফলই জোটে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে। 'হাভ' ও

'হ্যাভনটসে'র প্রশ্ন—তেমনি চাকরি নিয়ে। 'দেশী' ও 'বিক্রমপুরী' দু-এরই পেটি-বুর্জোয়া প্রার্থনা "চাকর রাখো জী।" প্রার্থনাটা আমলাবাজের কাছে—অথচ তখন স্বদেশীতেও সকলেই সক্রিয়! সেই আড়াআড়িতে যখন 'বিক্রমপুরী'রা কোনঠাসা, ঠিক তখন শতকরা ৭২জন সে যুদ্ধে নামল। দুয়েকেই কোনঠাসা করেও তারা থামল না। সাম্প্রদায়িক জেহাদের মুখে তখন 'দেশী'-'বিক্রমপুরী' দুইই ধুলোয় মিশিয়ে একাকার হয়ে যেতে থাকে। এ ১৯৪৬ সালের 'লড়কে লেঙ্গে'র কথা নয়। সেই জাতি-ভাঙার মহড়া বিশ বৎসর পূর্বেই এ শহরে শুরু হয়। অসহযোগের ব্যর্থতার সঙ্গেই খেলাফতের কর্মীরা সেখানে কংগ্রেসবিরোধী হয়ে উঠছিলেন। অবশ্য সে ভাঙন আগেই যেন বাস্তব হয়েই দেখা দিয়েছিল এ শহরে মেঘনার ভাঙনের আকারে। নদীর গ্রাসে সেই নোয়াখালি শহর যখন তার পথঘাট, বাগান, পুকুর, বাড়িঘর সবশুদ্ধ নিশ্চিহ্ন হতে লাগল তখন সেখানকার ভদ্রলোকের সেই বিশেষ ধাঁচের ঔপনিবেশিক পরিবেশও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে; তার ভাবনা ও জীবনযাত্রার রাজ্যেও ভাঙন হয় অনিবার্য। কিন্তু তারপরেও এ শহরে সেই জীবনের অসংগতি অসংগত হয়ে ওঠে নি। ততক্ষণ সেই 'পেটি বুর্জোয়া'র জীবনের মধ্যে সেই 'পেটি-বুর্জোয়া' ক্ষুদ্রতাও ঠাঁই পেত না এবং একটা সহজ ধরনের শ্রী ও সংযম ছিল, সবশুদ্ধ ছিল একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া।

প্রায় সকলেই এ শহরে নবাগত—পরস্পরের স্বজন। পরিবারে আর পরিবেশে তাই মিলন ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে। বাইরে পুরুষদের কর্মসূত্রে দেখা-সাক্ষাতে, আলাপে-গল্পে, আর অন্দরে গৃহিণীদের গতায়াতে, খবরাখবরে এ শহরের সমাজ আপনা থেকেই একটা আত্মীয়তার হাওয়ায় গড়ে উঠেছে। ধাঁচটা তার বৃত্তিজীবী বিক্রমপুরী ভদ্রলোকের—কিন্তু সম্পর্কটা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক আত্মীয়তার। আমাদের মতো শিশু ও বালকদের পক্ষে তাই সকল বাড়িই ছিল নিজের বাড়ি—বাধা ছিল না তাতে নিজগৃহে ও অন্য গৃহেও।

আমাদের ডাক্তারের বাড়ি—ঔষধপত্রের স্বচ্ছল ব্যবসাও আছে—যদিও ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা ভদ্রলোকের পক্ষে সহজ নয়। বাঙালী ভদ্রলোক মানেই মূলত কেরানি, অন্তত চাকরিজীবী। তবে তার মধ্যেও আমাদের বাড়িতে চাকরির বদ্ধ বাতাস অপেক্ষা বোধহয় 'স্বাধীন ব্যবসায়ের' মুক্ত হাওয়া বেশি বইত। দোকানের মিষ্টান্ন, বাড়ির বাসি রান্না, গুরু-পুরোহিতের

ভোগের প্রসাদ যেমন ছিল আমাদের নিকট আবাল্য অগ্রাহ্য, তেমনি বিলিতী ঔষধপত্র ও বিস্কুটের সঙ্গে আফাজুদ্দীনের পাঁউরুটিও ছিল বাড়িতে সুপ্রচলিত। স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করেও ভদ্রতার বিধি লঙ্ঘন না করে একটা সুস্থ নমনীয়তা ছিল বাড়ির আচারে-নিয়মে, শিশুদের লালনপালনে, শিশুদের শাসন-তাড়নে, আর শেষে যুবকদের প্রতি মিত্রবদাচরণে। অতটা ঢিলে আচার ও ঢিলে শাসন সকল পরিবারের পছন্দ হত না। আমাদের বাড়ির এই স্বচ্ছন্দ রীতির সমালোচনা অনেকে করতেন। কিন্তু বাইরের পক্ষে যেমন আমরা পাই নি শাসনের কঠিন নিষেধ, ঘরের মধ্যেও পাই নি আদরের অধিক প্রশ্রয়। মুক্তি ছিল সেই সংহত যৌথ পরিবারে মুক্তপদে চলার।

সমগ্র পরিবেশটা ছিল মাটিতে-মানুষে মিলে একই কালে গ্রামে-শহরে মিশ্রিত। নোয়াখালি শহর শেষ-অবধিও গ্রাম ও শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারে নি। সরকারি কাছারি কুঠি, জমিদার কাছারি, বাজারের খানিকটা—এই মাত্র পাকাবাড়ি। বাড়িঘরের থেকে বাগান বেশি, বাগানের থেকেও বেশি মাঠ। অধিকাংশ বাড়িঘর কাঁচা—ছনের চালা, মুলিবাঁশের 'তরজার' বেড়া, কাঁচা মাটির মেজে। পথঘাটে গাড়িঘোড়া লোকজন খুবই কম। এই সামান্য শহরের অসামান্যতা আমার কাছে এখনো তবু স্বতঃসিদ্ধ। লাল-ইটের গুঁড়োয় ঢাকা পরিচ্ছন্ন পথঘাট, দু-ধারে বাতাসের গুঞ্জনে ধ্বনিত ঝাউ-এর সার, নারিকেল-সুপারির ঘন ছায়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন অফুরন্ত বাগান, টলটলে জলে-ভরা দীঘি পুষ্করিণী, ঘাসে-ছাওয়া প্রকাণ্ড প্রান্তর, মুক্ত হাওয়ার অজস্র খেলার মাঠ, সমুদ্র সঙ্গমে দিগ্‌দেশহীন মেঘনার বান-ডাকা উন্মাদ রঙ্গ—আর সব শেষে তার মানুষ, সাধারণ মানুষ,—একজনও সেখানে জন্মান নি মহাপুরুষ, অসাধারণ মানুষ—সেই সাধারণ মানুষের অসাধারণতা—এ সব আমার কাছে শুধু স্মৃতি নয়, উত্তরাধিকার—যা ভোগ করতে পারি, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারি না।

বাস্তবত এই নোয়াখালিও এখন শুধু স্মৃতিরই সঞ্চয়, সুদূরের স্বপ্ন, Far Away and Long Ago-র কথা। কোনো বাঙালী হাড্‌সন জন্মালে তার কথা তেমন করে প্রকাশিত করতে পারতেন। আমরা বাঙালীরা সত্যই 'আত্মবিস্মৃত জাতি'। হয়তো আত্মায় সুষুপ্ত জাতি। আমরা আমাদের গ্রাম ও শহর নিয়ে কাব্যোচ্ছ্বাস করি। নাম-করা ফুল-ফল-লতাপাতার

একটা 'ল-সা-গু' করা বর্ণনায় তা সাজাই। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ গ্রাম, বিশেষ শহর, একটি বিশেষ নদীর পরিচয়ও কি আমরা লিখি? হয়তো আমরা তার পরিচয় জানি না, আমরা তা দেখিই না। বরং এদিকে দেখেছি, নীরদ চৌধুরী কিশোরগঞ্জের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে ছাড়া আত্মপরিচয় ভাবতে পারেন নি। কলিকাতার আকাশে আঁকা সৌধরেখা তার মনের পটে আঁক রেখেছে। কিন্তু নীরদ চৌধুরী তো "ইংরেজ"—বোধহয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ইংরেজ। The last of the Imperialist Englishmen. কিন্তু বাঙালীরা কেউ কি কলকাতা দেখেন না? কিম্বা দেখেন না নিজের গ্রাম, নিজের শহর? এই অতি-সমতল বাঙলারও নানা বিশিষ্ট রূপ আছে—গ্রাম-ছাড়া রাঙামাটির পথ আর ভরানদী ক্ষুরধারা ক্ষুরপরশা পদ্মার মতো কত রূপ তার, কে দেখে? দার্জিলিং, কালিম্পং যেতে হবে হবে কেন? চট্টগ্রাম শিলেটের রূপ কি কম? নোয়াখালি সে তুলনায় 'সাধারণ মেয়ে'। তবু বহু দেশ ঘুরে বহু দেশ দেখে যখনই আবার ফিরে আসি বাঙলায় তখনি দুয়ার হতে অদূরে দেখি 'একটি ধানের শিসের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'—মেঘনার মুখে টল-টলায়মান নোয়াখালি শহরটি।

এই নোয়াখালি ছিল নতুন জেলার নতুন সদর। তার ইতিহাস নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ভূগোলও এমন জটিল নয়। ভুলুয়া পরগণা 'বার ভুঞার' লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্য হলেই বা কি না হলেই বা কি, 'হদা ভুলা' সেই 'খোদ ভুলুয়া'র নাম হলেও যা না হলেও তা, আমার পক্ষে এদিনে একই কথা। আমার কাছে বরং তার ইতিহাস এই: রবীন্দ্রনাথ দু-বার তার উল্লেখ করেছেন, একবার 'রাজর্ষি'তে রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্যের পথের বর্ণনায়, আর-একবার 'একরাত্রিতে'—ছোট গল্পের পরিধিতে একটি অপূর্ব অনুভূতির বর্ণনায়। হয়তো ইতিহাসে আরও দু-এক পংক্তি যোজনা হয়ে থাকবে—কারণ প্রায় একই কালে এখানে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে এসে মিলেছিলেন তরুণ অচিন্ত্যকুমার, কিশোর হুমায়ুন কবির ও বালক বুদ্ধদেব বসু। তাঁরা কি সংগ্রহ করেছেন ওখান থেকে জানি না। ভবিষ্যতের গবেষকের তা জিজ্ঞাস্য। আমার জিজ্ঞাসা নেই—আছে সেই পরিবেশের পরিচয়।

নোয়াখালি চালাঘরের শহর। তার বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এক-একটি 'দ্বীপ'—সাহেব শাসকদের বিশাল কুঠি, চালাঘরের রাজ্যে আমলারাজের

রাজপ্রসাদ। শহর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, শহরবাসীর থেকেও। সেদিনের দু-একজন সাহেব মুরুব্বির মতো আমলা-কর্মচারীদের অনুগ্রহ করতেন, গাঁয়ের ছেলেদের চাকরি দিতেন; তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারও করতেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ছিল ব্রিটিশ রাজের প্রণীত ও বাঞ্ছিত ব্যবস্থা। দশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা দূর করে ফেলতে পেরেছিলেন তবু এ শহরে দু-একজন বড়ো কর্মচারী চেষ্টায়—সূর্যকুমার আগস্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আগস্তী সাহেব শহরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতেন, তাঁর গৃহে তাঁদের খানাপিনাও চলত, খানার চেয়ে পিনা কম থাকত না। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন এখানকার 'টাউন হল', আর টাউন হলে তাঁর বড়ো তৈলচিত্র ছিল তাঁর প্রতি শহরবাসীর প্রীতির প্রমাণ। টাউন হলটা শুধু এ শহরের সভাগৃহ নয়, একটা জীবন-কেন্দ্র—তাতে সংলগ্ন ছিল নাট্যমঞ্চ অর্থাৎ নর্মক্ষেত্র; ক্লাব বা গোষ্ঠীগৃহ, বিলিয়ার্ড, টেনিস, ব্রিজ খেলারও ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার। এ টাউন হল আকারে ছোট হলেও সৌন্দর্যে পরিচ্ছন্নতায় দর্শনীয়। লাইব্রেরি আগস্তীর প্রদত্ত ও নির্বাচিত দেশী-বিদেশী বই-এর জন্য আদরণীয়। বছর পনের পরে আই. সি-এস. মিস্টার জে. এন. গুপ্ত সকল ব্যবস্থার আরও উন্নতি করেন। সে আমলটা এ-শহরের একটা সমারোহের যুগ—গোল্‌ডেন এজ। তারপরেই দেখা দিল তাতে ভাঙন। আমরা দু-এরই সাক্ষী। দেশীয় শিক্ষিতদের সংস্পর্শ থেকে আপনাদের বাঁচাতে বিদেশীয় রাজপুরুষরা তখন নিজেদের স্বতন্ত্র ক্লাব গঠন করেছিলেন—মাঠের মধ্যে তৈরি হয়েছিল আর-একটি দ্বীপ। এই সরকারী শাসকদের থেকে বরং বে-সরকারী সাহেবদেরই কাজ মনে রাখবার মতো হত—যদি তা টিঁকে থাকত।

কারণ কোম্পানির সহেবেরা এখানে একসময়ে কুঠি গড়েছিলেন, সম্ভবত নূনগোলার কুঠি। জেলা-স্কুলের বাড়িটার এই পরিচয়ই আমরা শুনেছি। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল সেই বাড়ি—অদূরে উত্তরে প্রকাণ্ড লালদীঘি। তার কাছাকাছি দু-একটা কুঠি কাছারি। এসব বেশি দিনের জিনিস হতে পারে না। এখানকার বর্ষায় ও নোনা জলে সবই তাড়াতাড়ি জীর্ণ হয়ে যায়। এর থেকে বেশি পুরনো মনে হয়—ঝাউ-এর ঘেরা, ঝিল পাড়ের দোতলা 'শাদা কুঠি', তারও উত্তর পূর্বের মাঠের মস্ত লম্বা ঝিল ও উত্তরের ভাঙা কুঠি'—যা ভেঙে আমাদের শৈশবে তৈরি হয় দোতলা 'লালকুঠি'।

এখান থেকে সেই লাল সড়ক দু-ধারে সারি-সারি ঝাউ-এর চামর-দোলানো হাওয়া খেতে খেতে টাউন হলের লাল স্তম্ভের বাড়ি ও কেয়ারি-করা বাগান ডানদিকে রেখে—বাঁদিকে রেখে জুবিলী স্কুল, ডাকঘর, সোজা গিয়ে পৌঁছেছিল সরকারী কাছারিতে। ও-পথ দিয়ে টগ-বগ করে শব্দ তুলে জেলা জজ ইউসুফ সাহেব সদর্পে ওয়ালার ঘোড়ার টম-টম হাঁকিয়ে কাছারিতে যেতেন—আসতেন। আমরা জজ পেনাল সাহেবকে দেখি নি—জেলা পুলিশ সাহেবকে জেলে পাঠিয়ে এই আইরিশ-জাতীয় জজ সাহেব চাকরি খোয়ান, কিন্তু নোয়াখালির নাম ভারতবর্ষে পরিচিত করে যান। ১৯২৯-এ নোয়াখালির নাম শুনেই এর্নাকুলম-এর বর্ষীয়ান এডভোকেট বললেন—"নোয়াখালি অব দি পেনেল এ্যাণ্ড ওসমান আলী দারোগা।" ওসমান আলী সাহেবকে দেখেছি—প্রকাণ্ড বাড়ি জেলা স্কুলের উল্টোদিকে। পেনেল সাহেব থাকতেন কোথায় জানতাম না। ঝিলের কুঠি ও লালকুঠি ছিল আমাদের দিনে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি—তার আশেপাশে পুলিশ সাহেব ডাক্তার সাহেবের কুঠি। লালকুঠির পশ্চিম দিকে পুকুরের পরেই বিবির বাজার, আর পূর্বদিকে আমাদের পাড়া—বাদামতলা।

আমার কাছে নোয়াখালির প্রাণকেন্দ্র এই বাদামতলা। ও-শহরের আত্মা বাদাম গাছের কোটরে নেই, মেঘনার পাড়ে নেই, নারিকেল গাছের ডালেও নেই, থাকলে আছে একটা বিশেষ পরিবেশে। সেই পরিবেশের প্রথম পাদপীঠ এই 'বাদামতলা', তারপর সেই সঙ্গে ওই শহরের 'টাউন হল'। বাদামতলায় আমার শৈশব-বাল্য-যৌবন আপনার নিয়মে পাতার পর পাতা মেলে দিয়েছে। টাউন হলে আমার প্রথম যৌবন আপনাকে জানবার তাগিদে করেছে প্রথম নর্ম-রচনা ও কর্মায়োজন।

জানি না কোথা থেকে কে রোপণ করেছিল এ দুটি বাদাম গাছ; কেন রোপণ করেছিল তা অবশ্য সুস্পষ্ট। শহরের সর্বাপেক্ষা উঁচু গাছ এ-দুটি, তাই তার নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে একটা গোটা পাড়া। বাজার থেকে পূর্ব দিকে 'লালকুঠি' ছাড়িয়ে গেলেই বাদামতলার শুরু, ভুলুয়ার কাছারি এলাকায় পৌঁছবার পূর্বেই এ পাড়ার শেষ। পথটা অবশ্য সে কাছারি ছাড়িয়ে সেনপাড়া পেরিয়ে শেষ হবে গিয়ে কালীতারার দীঘি ও হাটে। এই পথ থেকে হাত বিশ-ত্রিশ দক্ষিণে বাদামতলার বাদাম গাছ দুটি বিরাট দেহ বিস্তার করেছিল। একটা ছোট সড়ক দু-গাছের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে দক্ষিণে, আমাদের বাসাবাড়ির বড়ো পুকুরটা বাঁ পাশে রেখে তার

দক্ষিণ-কোণ পর্যন্ত পথটা বিস্তৃত। এটা বাদামতলার পথ। এ পথেরই ঠিক পাশে দুই বাদাম গাছের গায়ে দুটো পাকা ইটের স্তম্ভ—কোন্ কালের পুরনো ফটকের শেষ চিহ্ন, সেই স্তম্ভ আর প্রহরী সেই গাছদুটো। কিসের ফটক তা কে বলবে? এই গাছের ছায়ায় পুকুরের কোণে আমাদের বৈঠকখানা; আর পুকুরের উত্তর পাড় জুড়ে আমাদের বাইরের প্রাঙ্গণ, পূর্বপাড় জুড়ে আমাদের অন্দর মহল। ভেতরে ছোট বড়ো দুটো উঠোন—বাসঘরের আর রান্নাঘরের। বড়ো উঠোনটা যেন উঁচু ঘরের বাঁধানো ভিটে, কিম্বা বাঁধানো চাতাল। মাটি আর শ্যাওলায় ঢাকা তার মশলা-বাঁধা ইট বর্ষায় ক্ষয় হয় না—শুধু বেরিয়ে পড়ে। কী ছিল এখানে? পুকুরের ঠিক উল্টো কোণে বাদামতলার সড়ক যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে—আমাদের দিনে সেখানে ছিল আনন্দবাবুর বাসা। সে বাসাবাড়ির অন্দরে প্রকাণ্ড বড়ো একটা বাঁধানো চাতাল। এইখানেই বা ছিল কী? আজকালকার দিনে হলে মনে হত—ধানকলের চাতাল। চতুর্থ একটা জিনিস ছিল সদর রাস্তা ও আমাদের বাসাবাড়ির মধ্যে—রাস্তা বরাবর নিচু একটা ছোট মাঠ। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ, আর তার অদূরে সেই মাঠে একটা পাকাবাড়ি—চার-পাঁচখানা তাতে ঘর, আর কিছুর চিহ্ন নেই কোথাও। এই বাড়িটাই বা কী? আমাদের জন্মের আগে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গবিদ্যালয়', সেই 'বঙ্গবিদ্যালয়'-এর পর্ব শেষ হয়ে গেলে 'বিদ্যালয়' হয় 'স্কুল', আর 'বঙ্গের' স্থান নেয় 'মাইনর'। আমাদের কালেই সে 'মাইনর' থেকে 'মিডল ইংলিশ' নাম নিয়ে কুলীনত্ব লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই জীর্ণ পাকাবাড়ি ভেঙে ফেলে তৈরি হল টিনের চালার, তরজার বেড়ার, বাধানো ভিটের তিন হাতার লম্বা ঘর—দেখে স্কুল না বলা অসাধ্য। কিন্তু মাঠটার নাম রয়ে গেল 'বঙ্গ বিদ্যালয়-এর মাঠ', আর পুরনো দিনের সাক্ষী রয়ে গেল ঝাউগাছটা—তার মাথায় হাওয়ায় জড়ানো চিরদিনের নিঃশ্বাস। কী ছিল সেই বাড়িটা? জানি না। আমরা বুঝতাম ওই 'ঝিলের কুঠি'—'ভাঙা কুঠি' থেকে এই বাদামতলা পর্যন্ত একটা এলাকা ছিল—যা বেশি অতীতের কথা নয়, তবু বিস্মৃত। বিস্মৃত বলেই প্রত্নতত্ত্ব আর প্রেততত্ত্ব বাদ দিয়েও তাতে রহস্যের স্পর্শ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কী ছিল সেখানে? কারা ছিল একদিন এই বাদামতলার ফটক-ঘেরা মহলের বাসিন্দা?

সে বাসিন্দারা এ শহরের জন্য কাজ এগিয়ে রেখে গিয়েছিল। সদর

স্থাপিত হলে নতুন করে সরকারী কাছারি, দপ্তরখানা ও সাহেবদের বড়ো বড়ো কুঠি গড়বার সুযোগ শাসকদের ভালোই জোটে। খালি জমি আর মাঠ ছিল পড়ে, বিনা দক্ষিণায় তার মালিকেরা তা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। তা ছাড়া, পূর্বেই সেই কুঠির সাহেবরা তৈরি করে গিয়েছিলেন এই সুন্দর সড়ক, দু-ধারে তার রোপণ করেছিলেন ঝাউ-এর সার, মাঝে মাঝে দীঘি আর ঝিল। তাঁদের আরেকটা কীর্তি তখন অব্যবহৃত, কিন্তু বিনষ্ট হয় নি—শহরের ঠিক বাইরে পূর্ব সীমায় 'ঘোড়দৌড়ের মাঠ'। শুপারি নারিকেল ঘেরা দু-তিনটি গ্রামকে ঘিরে প্রশস্ত একটা চক্কর। এ কালের মাঠের ক্লাব ঘরের থেকে অনেক তা লক্ষণীয়। এ চক্কর যারা তৈরি করেছিল আর তা ব্যবহারও করত তারা তো সংখ্যায় এক-আধজন হতে পারে না। অবশ্য তার থেকেও পুরনো বোধহয় পূর্ব ও পশ্চিম, দু-দিককার দুটি প্রধান দীঘি—শহরের পানীয় জলের তাই আধার। তবে এসবই বা কত কালের? পুরনো বললে বোধহয় শহরের দক্ষিণের ও পশ্চিমের দুটি গ্রামের কথাই বলা উচিত। দক্ষিণে সাহেবঘাটা—যেখানে বরিশাল হয়ে কলকাতার জাহাজ আসে। পশ্চিমে এজবেলিয়া—যেটা আমার শব্দতাত্ত্বিক বিদ্যায় বলে ইজাবেলারই অপভ্রংশ। কারণ, দু-গ্রামের বাসিন্দারাই পর্তুগীজদের বংশধর। তিন-চার শত বৎসরে গঞ্জাল্ভিস্-ফার্নান্দিজদের সন্তানসন্ততিরা এই দেশের জলে বাতাসে সম্পূর্ণ এদেশীয় হয়ে গিয়েছে। রঙে-রূপে কথাবার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কাজে-কর্মে, চাল-চলনে একেবারেই সাধারণ চাষী, মজুর। বরং একটু বেশি দরিদ্র, একটু বেশি নিরীহ। থাকবার মধ্যে আছে রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম, তার আইরিশ বা বেলজিয়ান পাদ্রির পৌরোহিত্য। আর সে চার্চের আওতায় দু-চারজনের সাহেবী শিক্ষা ও সভ্যতা এবং জীবিকার সুযোগ একটু আয়ত্ত করবার চেষ্টা। দু-এক অক্ষর ইংরেজি পড়ে, দু-একবার ফেল করে, রোজারিও, এণ্টোনিও, মার্ক প্রভৃতি আমাদের সহপাঠীরা কোট-প্যাণ্ট পরে রেল-এ কাজ জুটিয়ে নিয়ে সাহেবিয়ানায় পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। তার বেশি তাদের সাধ্যও ছিল না, স্বপ্নও ছিল না। মনে পড়ে লাকসাম জংশনে মাতাল টিকেট চেকার কী অন্যায় আচরণের জন্য ধরা পড়ে হাউ-হাউ করে অভিমানভরে ইংরেজিতে বলছে, "আমাকে তোমরা অপমান করছ। অধ্যাপক পার্সিভেল আমার খুড়ো—তোমরা তাঁর ছাত্র না?" আমরা নই, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পার্সিভেল-এর

নামে তখনো আমাদের পূর্বেকার দু-পুরুষ ছাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। অধ্যাপক পার্সিভেল ছিলেন চট্টগ্রামের লোক, একজন পর্তুগীজ বংশধর। কিন্তু দ্বিতীয় পার্সিভেল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো বংশেই কি আর বাঙলায় জন্মেছে? নোয়াখালির পর্তুগীজ বংশধরদের জীবনযাত্রা ছিল সঙ্কুচিত, নিস্তেজ, ...বসন—সর্ব রকমেই তারা নগণ্য।

নতুন পত্তনের সদরের জন্য এ জেলার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান কেউ বেশি কাজে লাগে নি—জীবিকার দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে তখনো তারা নারাজ, ইংরেজি শিখতেও উদ্যোগী নয়; তাই জেলার বাইরে থেকে শুধু কেরানি কর্মচারীই একা আসে নি। এসেছে উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-মাস্টার আর সেই সঙ্গে ছোট বড়ো দোকানী-পশারী, কারিগর মিস্ত্রি পর্যন্ত। পানাম সোনারগাঁর ব্যবসায়ীরা কাপড়ের একচেটিয়া কারবারী; ঢাকার কাঁসারিরা বাসন-কোসনের, মাদারিপুর-নড়িয়ার গোয়ালারা দধি ক্ষীর মাখনের, গোলদারী কারবার শিলেট-ত্রিপুররা-চাঁদপুরের ব্যবসায়ীদের একমাত্র স্থানীয় মুসলমানরা জুতো-জামা-লুঙ্গি ও সওদাগরী ব্যবসায়ে এগিয়ে আসে, দিন মজুরের কাজে আর কারিগরী কাজে জুটে যায়। অবশ্য দু-একজন করে শহরীয় হিন্দু-মুসলমান শিক্ষায় এগুতেই চাকরি পেতেন, ক্রমে ওকালতিতে মোক্তারিতেও যোগ দেন। আসলে শহরটায় তারাই বিদ্বান। আরও আশ্চর্য ব্যাপার—জমিদার যাঁরা তাঁরাও স্থানীয় নন—পশ্চিমবঙ্গের। কারণ, বোধহয় ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হত এক সময়ে কলকাতায়। পাইকপাড়ার লালাবাবুর বংশধররা 'ভুলুয়ার' জমিদার। সব চেয়ে বড় জমিদার তাঁরা। তাঁদের প্রেরিত নায়েব হিসাবে আর এক জনা 'অমরাবাদের জমিদারীর স্রষ্টা।' 'ডিলেনি' আছেন সাহেব (ফরাসীয়) জমিদার। কেউ প্রায় তাদের মহাল চক্ষেও দেখেন নি। দু-একজন 'দেশোয়ালী' জমিদারও আছেন। সরকারী বেসরকারী সকল কাজে যে ঢাকা-ফরিদপুরের লোকেরা অগ্রবর্তী, তাঁরাই এসব অনুপস্থিত জমিদারীর স্থানীয় নায়েব বা পরিচালক, আর সেই সূত্রে অনুপস্থিত প্রভুদের কতকটা প্রতিপত্তির দাবীদার। কেউ কেউ ছোটখাটো তালুকও এখানে কিনেছেন, আত্মীয়-পরিজন, গ্রামের বন্ধু-বান্ধব অনুগতদেরও সরকারী বেসরকারী নানা কাজে জীবিকা জুটিয়ে দিয়েছেন, দেশের মমতা না ছাড়লেও এই প্রবাসেই স্থায়ী হয়ে বসেছেন, বরং এ জেলার দু'চারজন যাঁরা কর্মসূত্রে শহরে এসেছেন, তাঁরাই শহরে অস্থায়ী। ছুটিছাটা কেন, শনিবার রবিবারেও গ্রামের বাড়িতে

চলে যান—পরিবার-পরিজন সেখানে। এ-শহর তাঁদের কাছে প্রবাস—যার যারা বাইরের তাঁরাই হয়ে আছেন এর বাসিন্দা।' শহরের পরিবেশটা সৃষ্টি করেছেন এই বাসিন্দারা—সেই বিক্রমপুরী উপনিবেশেরও যাঁরা উপজীবিকাজীবি। অতি অল্প করে হলেও তাঁরা কিন্তু একটা কথা বোঝে হয় বিদ্যা নয় বুদ্ধি নয় উদ্যোগ—এ ছাড়া জীবনে পথ নেই।

চালটা কিন্তু তাঁদের মোটা চালের—'চালাঘরের চাল।' বড়ো উকিলেরাও এক কালে পাল্কিতে গতায়াত করতেন, কিন্তু প্রায়ই থাকতেন খড়ের ঘরে। পাকাবাড়ি বলতে ভুলুয়ার জমিদারের কাছারিটাই ছিল প্রধান। দোতলা চকমিলানো বাড়ি—ভেতরে বাইরে প্রশস্ত দালান-বারান্দা, মধ্যখানে ঘাসে-ঢাকা চতুষ্কোণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তিন দিকে কোঠায় কোঠায় কাছারির নানা দপ্তর, মালখানা, তোষাখানা ইত্যাদি। পুরনো দিনের ঢাল, তলোয়ার, বল্লমের সঙ্গে কয়েকটা গাদা বন্দুক ছিল একটা বড় ঘরে। নানা ঘরে নায়েব, আমিন, সুমারনবিশ প্রভৃতির নিজ নিজ দপ্তর। দোতলার লম্বা হল ঘরে বড় সেরেস্তায় আমলারা বিস্তৃত ফরাসে বসে কাজ করছেন। একের পর এক বসে তাঁরা কাঠের ডেক্সের উপর খাতা লিখছেন, পিছনে ঠেস্ দেবার জন্য আছে ঘামের দাগ-পড়া এক-একখানা চওড়া কাঠ, ও প্রান্তে সেরেস্তাদারবাবু বলরাম সিংহ (জমিদারদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর একজন) কখনো গুড়গুড়ির নল হাতে এক-আধটুকু সই করেন, প্রায়ই কারও সঙ্গে গুড়গুড়ি টানতে টানতে গল্প করেন। দেউড়ীতে জলঘড়িতে বাটিতে সময় মাপা হয়, ঘণ্টা বাজে—আমার ছেলেবেলার মাস্টারমশায় ষোড়শী সেন মশায়কে দেখতে গেলে এসব দেখতাম। অবশ্য, কাছারিটা আমাদেরও চেনা—বাবাও ছিলেন জমিদারদের 'মোক্তার' অর্থাৎ বাঁধা উকিল; একটা ঘরে ছিল সেই আইন সেরেস্তা। আর তাঁর জ্যেষ্ঠ সুহৃদ প্রতিবেশী বসন্ত সেন ছিলেন সেখানকার ম্যানেজার—রাশভারী কড়া মানুষ, ওপরতলায় তাঁর কাঁচের ঘরের আপিসে যেতে আমরাও ভয় পেতাম—কর্মচারীরা কাঁপতেন।

ভুলুয়ার কাছারি আসলে একটা পাড়া। চারদিকে আমলা-কর্মচারী, ঘরদুয়ার, পাইক-বরকন্দাজ, ঘোড়াশালা নানা জিনিস। দক্ষিণে সদর রাস্তা—তার ওপারে কাছারির প্রকাণ্ড পুকুর। প্রশস্ত ঘাট নেমে গিয়েছে পরিষ্কার জলে। ঘাটের ওপর গুটি তিন বকুল গাছ, তিন দিকে বাঁধানো আলসে—পূর্ব দিকে ছোট শিবমন্দির—বকুল ফুলে ও গন্ধে ঘাটটা ভরে থাকে। কাছারিটা

ঘিরে সেদিনের জমিদারদের সর্ব আয়োজন। পার্শ্বের লালাবাবুর বংশধররা স্বভাবতই স্থাপন করেছিলেন গোপাল মন্দির—শুধু গোপাল নয়, একদিকে তাঁর জগন্নাথদেবের ছোট মন্দির ও রথ; অন্যদিকে গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ। সামনে পরিচ্ছন্ন নাটমন্দির। চারদিকে দেশী ফুলের সযত্ন পালিত বাগান—চাঁপায় বেলিতে, জুঁইতে, গাঁদায়, কাঞ্চনে শান্ত সুরভিত শ্রী ঘিরে থাকে গোপাল বাড়ি—ব্রজভূমির পূজারী বামুনটির ভক্তি ও রুচির তা পরিচয়।

আশ্চর্য কথা, গাছে পাতায় যে দেশ এত শ্যামল সেখানে কেন ফুলের বাগান এত অল্প? নোনা জলে ও ভেজা মাটিতে অবশ্য অনেক ফুল ও ফলের গাছ ভালো জন্মে না। আমাদের ল্যাংড়া আমের গাছটায় কখনো ফল দেখি নি। লিচু গাছটায় যা ফলতো তা আমাদের শিশুদেরও দুঃসাধ্য ভক্ষ্য। বাড়িতে বেল, গাঁদা, জবা, শেফালি, দোপাটির সঙ্গে ছিল পাতাবাহার। প্রকাণ্ড কদম গাছটার দান অজস্র ছিল—যেমন অজস্র দান ছিল কুল বেল আমলকি ও কাঠাল গাছগুলির। কিন্তু অনেক ফুল ফলই যে যত্ন পেলে ভালো ফলে তাও দেখেছি। শহরে সব চেয়ে সেরা বাগান ছিল যাঁর তিনি ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সাহেব, মারসোঁ। এখানে নাকি এসেছিলেন নিঃসম্বল, কিন্তু বছর চল্লিশে নিজের উদ্যোগে, কর্মবলে আর চর্মবলে তিনি সুসম্পন্ন ক্যাপিটালিস্ট ফার্মার আর দপদার-ব্যবসায়ী। তাঁর কুঠিতে ছিল গোলাপ ও নানা বিলিতী ফুলের কেয়ারি, যত্নে রোপিত বাড়ির চারদিকে নারিকেল, সুপারি, লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান। সাহেবদের সরকারী কুঠির বাগানে মাইনে-করা মালীর কাজ। মারসোঁর কুঠির ফুলের মতো ফুল তাতে ফোটে না। রুচির চর্চায় রূপের অনুভূতিতে এখনো সচেতন হয় নি কেন এখানকার মানুষ? প্রকৃতি যা দু-হাতে ঢেলে দিয়েছে তার দাম বুঝলে দু-হাতে তা নেয়। কিন্তু যার দাম না থাকলেও মূল্য আছে তাকে এখনো ভোগ করতে শেখে নি চোখ। নারিকেল-সুপারির চাষ বাড়াতে সবাই আগ্রহী, কিন্তু ফুলের সম্বন্ধে উদাসীন।

সুপারি আর নারিকেলের বাগানে বাড়িঘর সব ঘেরা। সে বাগান না থাকলেই আছে মাঠ—ঘাসে ঘাসে সেই মাঠ ঢাকা। গ্রীষ্মে ধু ধু করা মাঠ এখানে দেখা যায় না। চৈত্র-বৈশাখে রৌদ্র যখন কাঠ-ফাটা তখন শুধু ঘাসের ডগায় দেখা দেয় তাম্র আভা, গোড়ায় মাটির নিরার্দ্র শুষ্কতা, সেই সামান্য ধূসরতার আভাস শ্যামলতার উপরে দেখা দিতে না দিতেই কালবৈশাখীর রুদ্র খেলা শুরু হয়ে যাবে।

আকাশের রৌদ্রের আঁচ না নিভতেই ঘন ঘটায় পরিণত হবে অপরাহ্ণের মেঘ রেখা। কালো ঘন কৃষ্ণ পাখা ছড়িয়ে ছুটে আসবে কালো বৈশাখী। আকাশ ঢেকে যাবে; বিদ্যুতের ছটা চমকে উঠবে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, গুরু গর্জন যাবে তার পিছনে পিছনে ধেয়ে বজ্রের দেবতা দিক থেকে দিগন্তরে। বাতাস উদ্দাম হয়ে সুপারি নারিকেলের মাথা নুইয়ে, আলুথালু করবে তার চুলের রাশি। অন্ধ কোনো গাছের ডাল ভেঙে, পাতা ছিঁড়ে, কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলিকে দশ হাতে লুঠে উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেবে মাঠে, পথে—লাল সড়কের উপরে—মাতামাতি শুরু করে দেবে ডাল, পাতা, ফুল পাক খেয়ে উঠবে এক-একটা ছোট ঘূর্ণীতে। তারপর আসবে টপটপ করে বড়ো ফোঁটার বৃষ্টি। কর্ণবিদারী বজ্রনির্ঘোষ, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর পৃথিবী তার তলায় মুহুর্মুহু বজ্রাঘাতে কাল-বৈশাখের বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর মতো আকাশের প্রান্ত থেকে পৃথিবীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আকাশ থেকে নেমে আসছে তীরের ধারা। গাছের মাথার উপর দিয়ে, মাঠের খোলা বুকের উপর দিয়ে দীঘির দোলা-লাগা বুকের উপর দিয়ে বৃষ্টি সহস্রধারায় ছুটে আসবে দূর থেকে নিকটে, তারপরে একেবারে চারদিকে—ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল যেন সব—ঝম্ ঝম্ করে এবার নামল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মতো দুরন্ত ধারা, অশান্ত আকাশ, দুর্দান্ত মেঘগর্জন ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কালবৈশাখী পৃথিবীর বুকে যেন ক্ষ্যাপা দেবতার মতো তাণ্ডবের খেলা খেলতে নেমেছে। মাটি ভিজে উঠল, গাছ-পাতা ধুয়ে নির্মল হয়ে গেল, জল জমতে লাগল ঘাসের গোড়ায়, মাটির ভেজা আঙিনায়। শুকনো গাছপাতা ধুয়ে চালা-ছাউনি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। গড়িয়ে পথ খুঁজে চলল ছোট ছোট জলের ধারা। তারপর আরও তা প্রশস্ত হল, আরও তা প্রবল হল পথ ঢেকে, মাটি ধুয়ে গড়িয়ে চলল নালা-ডোবা-খালের সন্ধানে। এখানে-ওখানে ঘাসের গোড়া ডুবে গেল—জলের মধ্যে জেগে রইল তার ডগাগুলি। শ্যামলতার বদলে দেখা দিল এক সজল স্বচ্ছতা, নতুন জলের রজত-ধারা। সেই জলের বুকে আবার বৃষ্টির অবিশ্রান্ত নৃত্য। এক-একটা বৃষ্টির ফোঁটা জলের উপর পড়ে, তখনি ফুটে ওঠে একটা জলের ফোঁটা হয়ে শত শত, হাজার হাজার ফোঁটা—বয়ে চলে সার বেঁধে। একে অন্যের গায়ে মিশে ফেটে যায়, আবার গড়ে ওঠে, বড়ো হয়ে আবার ভাঙে। বৃষ্টির ফোঁটা নয়, আকাশ-চ্যুতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্সরার দল পৃথিবীতে নৃত্যের নিমন্ত্রণ পেয়েছে।

চোখের সম্মুখে ঘরের দুয়ারে পেতে বসেছে রূপের হাট। কিন্তু কতক্ষণ? হয়তো সূর্য পাটে নামবার আগেই এই ঘনঘটা মুছে যাবে, এই নৃত্যের আসরও ভেঙে যাবে। আর পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্রের ঝলক ঝিকমিক করে হেসে ছড়িয়ে পড়বে শেষবারের মতো পৃথিবীতে। ঘাসের ডগায় জলবিন্দুতে লেগে যাবে সোনার আভা। সকালবেলা যখন সূর্যদেব ফিরে আসবেন তখন সেই বৈশাখের তাপ-ম্লান গাছ-পাতা, নারিকেল বন, মাঠের ঘাস বর্ষণ-স্নাত নতুন স্নিগ্ধতায় শ্যাম সুচিক্কণ হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে রুদ্র বৈশাখও আতাম্র সন্ন্যাসী নয়। শ্যাম সুশোভন—আষাঢ়ের পূর্বেই এসে যায় বর্ষা—আর আশ্বিনের আঙিনা ছাড়িয়ে কার্তিকেও তার বর্ষণের শেষ নেই।

সেই দীর্ঘ বর্ষা আমার ভালো লাগত না। চৈত্র-বৈশাখের পরে বর্ষাকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে শরৎকালে পৌছাতে পারলে কী আনন্দই হত! অনেক সময় মনে হয়েছে একবার রবীন্দ্রনাথকে এখানে বর্ষা যাপন করতে হলে দেখা যেত তিনি আর বর্ষামঙ্গলের কথা পাড়েন কিনা। না, তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো খালি পায়ে ছাতা মাথায় হাট-বাজার করতে হত না, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় সাবধানে গুছিয়ে যেতে হত না ইস্কুলে আপিসে, ভেজা গায়ে বসে লিখতে হত না দপ্তরের হিসাবপত্র। না হয় ওই ঝিলের বাড়ির কুঠিতেই তিনি থাকতেন—ক্ষুধিত পাষাণ না হোক এই ঝিল-ঝাউ-এ ঘেরা শাদা বাড়িটার মধ্যে এককালের ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিলুপ্ত জীবনকথা তো কম রহস্যময় অনুভূতি জাগায় না। এখানে বসেই তিনি দেখতেন—দক্ষিণের মাঠের উপর দিয়ে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি—জলে-জলাকার মাঠটা, সবুজ ঘাসের উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃষ্টি এক-একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিচ্ছে। খাল নালা জল বয়ে উঠতে পারছে না। সব ছাপিয়ে সেই বর্ষার জল একেবারে ঘরের দুয়ারে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। আকাশে মেঘ আর মেঘ আর মেঘ। কবির জন্মের দোসর তপনদেব দিনের পর দিন আর একবারও তাঁর সন্ধান দেন না। নিশ্চয়ই তিনি তবু কবিতা লিখতেন—কিন্তু কাউকে কি তিনি তা শোনাতে চাইতেন? কইতে চাইতেন কাউকে—"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী?" কাকে বলবেন? কাউকে নিয়ে চাইতেন বর্ষামঙ্গলের উৎসব করতে? কোথায় সেই লোক। আমরা তো অস্থির হয়ে পড়তাম ঘরে বন্দী থেকে। লতাপাতায়, মাটিতে, ঘরে-বাইরে একটা শ্যাওলা-ধরা আর্দ্রতা। রথযাত্রা-ঝুলনে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। ভাদ্রের অমাবস্যা, পূর্ণিমায় মেঘনার 'বান' শুধু সমস্ত শহরকে টেনে

নিয়ে যেতো নদীর পাড়ে—সে দৃশ্য অবশ্য আর কোথাও দেখা যেত না। না হলে বৃষ্টিতে ভিজে প্রথম যে উল্লাস ভোগ করেছি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ়-শ্রাবণে তাতে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে। শরতের নাগাল পেয়ে বাঁচলাম। বর্ষা কেউ ভালোবাসতে পারে? পথে বেরুবার উপায় নেই। ছাতায় বৃষ্টি বারণ হবে না। জুতোর প্রশ্ন নেই। জল কেন, পাকা সড়কও ভিজে কাদামাখা হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা না হতেই সন্ধ্যা—চারিদিকে ভেকের ব্যাও, রাত্রিব্যাপী সেই শব্দ। দিনব্যাপী রাত্রির অন্ধকার। সূর্যের মুখ দেখি না সাত দিনেও—আর সূর্য না দেখলে মানুষ বাঁচতে পারে? লণ্ডন কেন, সূর্যহীন স্বর্গও আমি চাই না!

কিন্তু নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথেও ভালো লাগত এখানকার নারিকেলের বাগান। এটা বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথ তার শালবন-তালবনের দেশে আর শিলাইদর পদ্মা আর গেরোই নদীর পাড়ই শুধু দেখলেন। পূর্ব বাঙলার ঘন সবুজের রাজ্যে তিনি বাস করলেন না—নোয়াখালি-বরিশালের নারিকেল বনের শ্রী উপভোগ করবার মতো অবকাশও তাঁর হল না। নোয়াখালি বলতেই আমার কাছে বোঝায় তার ঝাউ-এ ঢাকা সেই লাল সড়ক, আর তার ঘাসে ঢাকা মাঠ ও সুপারি নারিকেলের বাগানে ঘেরা ছনের ঘর। অনেক দূরে অনেক দেশে দেবদারু পাইনের নানা রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি—ভুলবার নয় সে সব রাজ্য, দেশের বা বিদেশের। আমি আমার স্ত্রীর মতো গাছ ও ফুল দেখে পাগল হই না। যে গাছটিকে অতি পরিচিত জেনেও আমি মুগ্ধ নেত্রে দেখতে পারি তা ওই নারিকেল গাছ। বন্ধুরা বলবেন হয়তো—"ফল চুরি করে খাওয়া ছিল তোমার কিশোরের ও যৌবনের প্রধান একটা ব্যসন—তার জন্যই তোমার ও গাছটির জন্য দরদ।" মুসলমানের মুর্গী পোষা। ঘটনাটা সত্য, ইঙ্গিতটা সত্য নয়। কৈশোরের দুরন্তপনায় জীবন উপভোগের যে তাড়না নিজের মধ্যে ছটফট করে বেড়াত তাতে আমাদের কাছে দুরারোহ নারিকেল গাছ হত একটা চ্যালেঞ্জ, তার ডাব চুরি ছিল একটা এ্যাডভেঞ্চার, আর সে জন্য লোক গঞ্জনা তিরস্কার ছিল আমাদের উদ্ধত আত্মপ্রসাদ। কিন্তু নারিকেল বন এজন্যই সুন্দর, এমন কথা বললে আজ বার্ধক্যের পাকা চক্ষুও তা মেনে নেবে না। অনেক গাছই সুন্দর—দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বুকে অশ্বত্থকে দেখে উপনিষদের ঋষিরাও ধ্যান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতেন—দিবি তিষ্ঠত্যেক! এমনিতর, যেখানে যার শোভা। সাজানো বাগানে বিদেশী পামই কী অপূর্ব সুন্দর নয়? কিম্বা সাঁওতাল

…গণায় ইকিউলিপটাস? শিলং-এ কিংবা হিমালয়ের কোলে যে পাইনের …ন তাতে কি আপনাকে সঁপে দিতে ইচ্ছা করে না? তবুও এক-একটা জিনিসের এক-একটি আছে বিশেষ পরিবেশ। ওই শ্যামল পূর্ব বাঙলায় লবণার্দ্র ভূমিতে ঝাউ আর নারিকেলই সুন্দরতম—ঝাউ-এর মাথায় বাতাসের গুঞ্জন, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, নারিকেলের পাতায় বাতাসের খেলা, সূর্যের আলো আর জ্যোৎস্নার রজত-বৃষ্টি—এ না দেখলে এদেশ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম সচেতন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছিলাম এই পরিবেশে।

স্কুলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আঙিনা থেকে এই পরিবেশের প্রাঙ্গণে এসে গেলাম। বাদামতলা থেকে পথ এগিয়ে গেল দক্ষিণে আকাশ-ছোঁয়া মাঠের পর মাঠে—আর স্কুলের ঝাউ-এ ঢাকা পথে শহরের নানা দিকে লোকালয়ে। বাড়ির চেনা মুখের সঙ্গে দেখা দিল বাইরের নতুন-চেনা মুখ। বাড়িতে পেয়েছিলাম খোলা মনের আবেষ্টনী, স্কুলে পেলাম খোলা পথের আমন্ত্রণ—Call of the Open Road.…

সে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সেই মানুষের পরিবেশ দুই-ই অন্তর্হিত। আমিও তা ছাড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে রাত্রির পর্দা সরিয়ে স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয় সেই বাদামতলার প্রশান্ত বিস্তৃত ছায়া; সেই ঝাউ-নারিকেলে ঘেরা, মেঘনার প্রবলোচ্ছ্বাসে ধোয়া ছোট নোয়াখালি শহর। শুধু 'পেটি বুর্জোয়া'র শহর বললে তার মাটিতে-মানুষে মেলানো সেই পরিচয় শেষ হয় না—ভারত-ইতিহাসের বিংশ শতকের প্রভাতে ধানের শিসের উপরে টলটলায়মান একটি শিশির বিন্দু।

(ক্রমশ)

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

লাতিন সাহিত্যে দু'হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় গল্প

পর্যটক বা রাষ্ট্রদূতের রোজনামচা থেকে তথ্য চয়ন করে ইতিহাসের মালমশলা জোগাড় করা—প্রাচীন ইতিহাস রচনার চলতি রীতি। ভারত-রোম সম্পর্কের ইতিহাসও এইভাবে লিখিত হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস-গঠনে এই জাতের তথ্যপুঞ্জ নিশ্চয়ই অতি প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের রসাল আধারে সে মালমশলার সন্ধান মেলে ইতিহাস রচনার চলতি রাস্তায় তার দাম এখনও নগণ্য বলেই বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিকেরা যাই বলুন, সাহিত্যরসিকের কাছে এর কিন্তু স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে।

দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন লাতিন কবি ওবিদ্‌। রোম সেদিন ঐক্যবদ্ধ হতে চলেছে। কবি ওবিদের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩ অব্দে আর ২৬ অব্দে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজার দূত রোমের সিংহদ্বারে করাঘাত করছে মৈত্রীর বাণী নিয়ে। তারপর দুশো বছর ধরে চলল ভারত-রোমের ঘনিষ্ঠতা।

দূত পাঠিয়েছিলেন কুশান সম্রাট দ্বিতীয় কদফিস রোমক সম্রাট ট্রাজানের (৫৮ খৃঃ—১১৭ খৃঃ) সভায়। কুশান সম্রাট কনিষ্কের সময়েও এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। কনিষ্কের তো আর একটি উপাধিই ছিল Kaiser বা Caesar; খবরটি জানিয়েছেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌ ডঃ লুদার্স (Luders)। [১]

কুশান-বংশীয় বা কুশান যুগের মুদ্রা থেকেও এই সম্পর্কের ইতিবৃত্ত সংকলিত হয়েছে। কুশান সম্রাট কদফিসের মুদ্রায় রোমক সম্রাটের ''মস্তকের' ছাপ ছিল। পণ্ডিতপ্রবর র‍্যাপসন, এ্যালান প্রভৃতি এই মুদ্রাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। মোটামুটি এইসব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যোগাযোগ বেশ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

দুই

ওবিদের সমসাময়িক হলেন ভার্জিল ও হোরেস। ভার্জিল হলেন রোমের জাতীয় কবি, যে-অর্থে হোমার গ্রীসের জাতীয় কবি, বাল্মীকি ও ব্যাস ভারতের

জাতীয় কবি। ভার্জিলের মহাকাব্যে রোমের মহিমামণ্ডিত ভবিষ্যতের বর্ণাঢ্য চিত্র আছে। ভার্জিল হলেন যথার্থই ক্লাসিক শিল্পী; আর ক্লাসিক যুগে জন্মেও ওবিদের মেজাজটি ছিল রোম্যান্টিক। তাই ওবিদ্‌ তাঁর যুগে শুধু অনাদৃত নন, নিষিদ্ধ। পরবর্তী যুগে তিনি হলেন মন্ত্রদাতা—রেণেসাঁসের গুরু। তাঁর জনৈক সাম্প্রতিক অনুবাদকের ভাষায়: "Providing a source from which the whole of Western European literature has derived inspiration." দান্তে, বোকাচ্চিও, চশার—সবাই তাঁর দৌলতখানার দোরে গিয়ে হাত পেতেছেন, এবং পেয়েছেন যা তা ধুলিমুঠি নয়, স্বর্ণমুঠি। ওবিদের প্রথম গ্রন্থ হল Amores। Heroides, Ars Amatoria, Metamorphoses তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

ওবিদের Ars Amatoria ও Metamorphoses গ্রন্থদ্বয়ে দুইটি পুরনো ভারতীয় গল্প অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। ওবিদের রসিক মনের ছাপ আছে গল্প দুটির দেহে, তাই শুধু ঐতিহাসিকদের নয়, পরিবেশিত হলে সাহিত্যিকদেরও রমণীয় হতে পারে। Metamorphoses-এর গল্পটাই প্রথম বলছি। ওবিদ গ্রীক সূত্র থেকে 'রূপান্তরে'র নানা উপাখ্যান জড়ো করে একটি মালিকা গেঁথেছেন। গল্পগুলি বিচ্ছিন্ন; ভারতীয় সংগ্রহ-পুস্তক বেতাল পঞ্চবিংশতি, দশ পুত্তলিকার মতোই তার রচনাশৈলী। শুধুমাত্র রূপান্তর গ্রহণের প্রসঙ্গগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। আমাদের গল্পটিও এই ধরনের একটি; গ্রীক সূত্র এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

গল্পের নায়কের নাম অথিশ (অতীশ ?) তার জন্ম ভারতের প্রাণ প্রবাহিনী নদী গঙ্গার কাঁচ-স্বচ্ছ বারিপুঞ্জের গহীন দেশে; তার মা এক জলপরী। মায়ের নাম লিমনাই। অপরূপ দেহকান্তি অতীশের, দামী পোশাক-আশাক পরলে সেই দেহকে আরও সুন্দর দেখাত। [২]

তখন তার ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে, শক্তির মধ্য গগনে সে উপনীত। স্বর্ণখচিত রক্ত ও বেগুনীবর্ণ অঙ্গাবরণ সে পরিধান করত। কণ্ঠে শোভা পেত স্বর্ণহার, সুবাসিত কেশরাশিকে সে সোনার ফিতা দিয়ে জড়িয়ে রাখত। [৩]

বর্শা নিক্ষেপে তার এতই পটুত্ব ছিল যে যে-কোনো লক্ষ্যই সে বিদ্ধ করতে পারত, সে লক্ষ্য যত দূরবর্তীই হোক না কেন। তীর ধনুক ব্যবহারে সে ছিল দক্ষতর। [৪]

কিন্তু এই সময়ে সে ধনুকের কোণা বেঁকিয়ে জ্যা আরোপ করছিল, বেশ

কিছুটা গায়ের জোর দিয়েই। পারসিউস আচম্বিতে যজ্ঞবেদী থেকে ধূমায়িত কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিয়ে তাই দিয়ে তাকে ভূপতিত করল। তার (অতীশের) মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেল, তার মুখখানা খুলির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।[৫]

লাইকাবার্স নামে এক আসাইরীয় যুবক অতীশের ছিল ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। অতীশের প্রতি তার হৃদয়ে ছিল সুগভীর প্রেম ; এবং সে কথা সে গোপন করতে চাইত না।[৬]

সে দেখল সাংঘাতিকভাবে আহত অতীশ তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে ; যে দেহকান্তিকে সে এত উচ্চ প্রশংসা করত, সেই দেহ আজ রক্তের প্লাবনে আছাড়িবিছাড়ি করছে। লাইকাবাস প্রথমে তার বন্ধুর জন্য অশ্রুমোচন করল।[৭]

ঠিক সেই সময়ে লাইকাবাসকেও মারাত্মকভাবে আঘাত করল এক্রিসিউসের পুত্র। লাইকাবাসের চোখে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল, জলসিক্ত চোখে সে চারপাশে তাকাল, তার চোখ দুটি অতীশের খোঁজ করে ফিরছিল, অতীশেরই পার্শ্বে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে সে মরল যে মৃত্যুতে তারা একত্র হতে পেয়েছে।[৮]

গঙ্গা! একটিমাত্র নদীর নাম স্মরণে ভারতের কত কাছের মানুষ হয়ে পড়েছেন কবি ওবিদ।

আসাইরীয় যুবকের সঙ্গে ভারতীয় যুবকের এই সৌহার্দ্যের বার্তাটুকুও প্রচুর ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ—মহেঞ্জোদারো থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত ভারতের বহির্বিশ্ব সম্পর্কে এই সংবাদ অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের গভীরতাটুকুও প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় যুবকের দেহশ্রী, বীরত্ব সব কিছুই উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—লেখকের রচনার বিশিষ্ট বর্ণ-সুষমা এই ক্ষুদ্র চিত্রেরও নানা স্থানে পড়েছে।

দ্বিতীয় গল্পটির সাক্ষাৎ পাচ্ছি—Ars Amatoria কাব্যে। গল্পটিতে দু হাজার বছর আগেকার এক সুপ্রাচীন জব চার্ণকের সন্ধান মিলছে।

কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা মান্যবর জব চার্ণকের কথা বলছি না ; হিন্দু বিধবার পাণিপ্রার্থী প্রেমিকবর জব চার্ণকের কথা বলছি।

Ars Amatoria-তে প্রেম-বিদ্যার নানা পাঠ আছে ; কবি স্বয়ং কাব্যের ভূমিকাতে বলে নিয়েছেন যে তিনি হলেন "singer of an idle day !" কাব্যের প্রথম খণ্ডে "কি করে প্রেম অর্জন করা যায়" (How to win

love)—এই মূল্যবান হিতোপদেশ দেবার ছলে তিনি দ্বিতীয় গল্পটি একবারে সূত্রাকারে বলেছেন।

পারসিউস সুদূরতম ভারতবর্ষ থেকে তার কালো পুতুল আন্দ্রোমেডাকে এনেছিল।[৯]

তারপর কাব্যটির তৃতীয় খণ্ডে ঐ গল্পটি পুরো বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি এইরূপ :

আন্দ্রোমেডা (এটা) আশাও করতে পারে নি, কারণ তখন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চিতায় তোলা হচ্ছে—সহমরণে চলেছে সে। ঠিক তখনই আকাশ-পথে চলেছিল পারসিউস। চিতায় সুন্দরী রমনীকে দেখে সে তার গতিবেগ সংযত করল, নেমে এল মাটিতে, হাতের বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিল। একটু আগে যে ছিল চিতায়, সে হবে সুখী বধূ।[১০]

এইভাবে জাল না পেতেই এবং না চাইতেই মৃগরা ধরা পড়ল। অন্যদিকে তোমার শিকারী কুকুরগুলো অযথা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।[১২]

বহু সময়ই বিধবারা চিতার আগুনের পাশে বসে তাদের কৃশগণ্ড ও বিস্রস্ত কেশপাশের সাহায্যে অন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত করে থাকে এবং সোজাসুজি সেখানেই দ্বিতীয় স্বামীর সাক্ষাৎ ঘটে যায়। কারণ অশ্রুবর্ষী চোখে এবং অশ্রুসিক্তবদনে এক বিশেষ রকমের মাধুর্য লুকিয়ে আছে।[১৩]

গল্প দুটিই নিছক গল্প। হয়তো বা গালগল্প। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট গল্প। ভারতের আচার ব্যবহারের সঙ্গে কবির সম্যক পরিচয় ছিল।

এখানে একটি মজাদার খবরও পাওয়া গেল যে ভারতীয় নারীর কালো রঙটাই পরদেশী পুরুষের পক্ষে আকর্ষণের বিশেষ হেতু হতে পারে। মেয়েটি কালো, কিন্তু এই খবরটি রঙীন। রমণীর নাম আন্দ্রোমেডা, হেক্‌টার-পত্নী আন্দ্রোমেকা নয়, কিন্তু আওয়াজটা কান-ঘেঁষা।

এ-যুগে ভারতীয়রা ইলিয়াদের গল্প জানত হয়তো বা পড়ত। খবরটি শুনিয়েছেন গ্রীক বাক্যবিদ (Orator) ডিওন ক্রাইসস্টম্। কাজেই তখনকার আধুনিক পিতামাতারা মেয়ের নাম গ্রীক অনুকরণে আন্দ্রোমেডা রাখলেও রাখতে পারেন। এ-যুগের বাপ-মায়েরা মেয়ের নাম লিলি, শেলী, এমন কি হেলেন রাখতেই কি লজ্জা পান ?

তিন

ওবিদের Metamorphoses গ্রন্থে ভারতবর্ষের উল্লেখ আরো আছে। ওবিদ সমসাময়িক ভার্জিলও তাঁর Georgios ও Aenid গ্রন্থদ্বয়ে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন। Aenid থেকে ভারতপ্রসঙ্গের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা ক্ষান্ত হব।

Aenes-এর বিরোধী শক্তির নেতা হলেন Furnns। তাঁর নেতৃত্বে Latinum-এর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে চলেছে। সৈন্যদলের এই অগ্রগতিকে কবি বলছেন "That march was like Ganges rising silently and deepening along all his placid streams or Nile, when he was withdrawn his enriching currents from the river-plains, and is settled in his own bed once more (IX—30-34). এখানেও সেই গঙ্গা !

গঙ্গা নদীর গতিধারা সম্পর্কে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তবেই শুধু এই রকম ছোট্ট উপমার অবয়বে এত বড় সংবাদ স্বচ্ছন্দে ধারণ করা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা হল গাঙ্গেয় সভ্যতা। সেদিন গঙ্গা ও নীলনদ শুধু উপমার ক্ষেত্রেই পাশাপাশি বসত না—নব জীবনের যোগাযোগেরও সূত্র ছিল এই দুইটি নদী। লাতিন সাহিত্যে সেই পুরনো স্মৃতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে বহু বছর শুধুমাত্র এই ঔদার্যের জোরেই টিকে রয়েছে। হয়তো টিকে থাকবেও।

১। Political History of Ancient India—H. C. Roy Chowdhury, 6th Edition, 1953 পৃষ্ঠা ৪৭১

২। There was Athis, an Indian, who was supposed to have been born under the glassy waters of the Ganges, his mother Limnace being one of the nymphs of the river. He was a wonderfully handsome boy, whose beauty was enhanced by his rich clothing (Metamorphoses—Ovid. Translated by Mary M. Innes. Penguin Books. পৃষ্ঠা ১২৭)

৩। Just sixteen years old, and in the flower of his strength he wore a cloak Tyrian purple, bordered with gold, chains of gold adorned his neck, a golden headband encircled his perfumed locks. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৪। He threw his javeline with such skill that he could hit any mark however distant and was even more adept with his bow. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৫। But on this occasson, as he was forcibly bending its pliant horns, Persens snatched up a brand which lay smoking on the altar, and struck him down. The bones of his skull were smashed, his face crushed into them. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৬। Lycabus, an Assyrian, was Athis' closest comrade and had never concealed his true affection for him. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৭। When he saw Athis breathing out his life, sorely wounded, the features he had praised so highly twitching in a welter of blood Lycabus first wept for his friend. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৮। Son of Acrisius killed him. Lycabus though dying, looked around with swimming eyes, as the 'darkness closed in on him ; he looked for Athis, fell beside him, and bore to the shades the comfort that they were together in their death. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৮)

৯। Persues from farthest India brought Andromeda his dusky toy ; (Ars Amatoria—Ovid. Translated by F. A. wright. George Routledge and Sons Ltd. 1923. পৃষ্ঠা ১০৭)

১০। How could Andromeda have hoped
When she was to the diff—side.tied.
That by the flying man unroped
She would become a happy bride. (ঐ পৃষ্ঠা ২৭১)

১২। Thus stags unsought by nets are ta'en
While your hounds scour the hills in vain.

১৩। Often a widow by the pyre
With pallid cheeks and hair unbound
Has kindled there another fire.
And stairght a second husband found,
For there is a peculiar grace
In streaming eyes, and tear stain'd face. (ঐ পৃষ্ঠা ২৭১)

সরোজ বন্দোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

নন্দিনীই প্রথম আবিষ্কার করল যে মায়ের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ও জেগেছিল। প্রিয়ব্রত যে গ্রাম্যের মতো ভাতের ওপর রাগ করে তার জোর খাটাতে চাইবে এটা তার অনুমানের বাইরে ছিল। এবং এতদিনে সে বুঝতে পারছিল যে প্রিয়ব্রতকে সে সবটা বুঝতে পারে নি। প্রিয়ব্রতর উচ্চাশা প্রিয়ব্রতর বাহন নয়। প্রিয়ব্রতই তার নিজের উচ্চাশার বাহন। এই প্রিয়ব্রত যখন নন্দিনীর ওপর জোর খাটাতে চায় তখন সেটা নন্দিনীর কাছে স্পর্ধা বলে মনে হয়। আর প্রিয়ব্রত যখন নন্দিনীর শরীরটাকে আদর করে নিজের পথে নন্দিনীকে নিয়ে যেতে চায় তখন নন্দিনীর মনে হয় এর চেয়ে ট্রাম-বাসের সেই কাছ-ঘেঁষে দাঁড়ানো লোকগুলিও ভালো। এই সব ভাবতে ভাবতে নন্দিনীর আর ঘুম এল না। এলোমেলো চিন্তা বড়ো বড়ো ছায়া ফেলতে লাগল ওর অনিদ্রার আকাশে। আর কখনো কখনো টুকরো টুকরো স্বপ্নের ভ্রূণ কিম্ভূত অসম্পূর্ণ আকার নিয়ে চোখের সামনে ভেঙে যেতে লাগল। কাদের বাড়ির কচি ছেলের দামাল কান্না শুনতে শুনতে নন্দিনী ভাবল খোকাটার মা বেকুব। এ্যাপ্রণ-পরা নার্সের মতো মনে হত লাগল শীর্ণ করবী গাছের ছায়াটাকে। একবার নিজেকেই দেখল ভাঙা স্বপ্নে অসহ্য যন্ত্রণায় নিরাবরণ। বাতাসে ডেটলের গন্ধ। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে প্রিয়ব্রত অশ্লীল ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে। কচি ছেলেটার কান্না হঠাৎ থেমে গেল। গায়ের জামাটা আলগা করল নন্দিনী, শির শির করে উঠল তার বুকের ভিতরটা।

তার পরেই আচমকা সে অনুভব করল তার শাশুড়ির কাশির পরিচিত শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। ও নিচেয় নেমে গেল। দু-বার দরজার বাইরে থেকে 'মা' 'মা' বলে ডাকতেও যখন সাড়া পেল না, তখন জানলার

কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নিঃশ্বাসের শব্দটা কেমন বিলম্বিত ও অস্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি সুব্রতর ঘরে দু-বার ধাক্কা দিয়ে নন্দিনী ওপরে এসে প্রিয়ব্রতকে ডেকে তুলল। প্রিয়ব্রত হাই তুলে উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকাল। অনেক কষ্টে দরজাটা খুলে ওরা সকলে যখন মায়ের ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল তখন নন্দিনী বুঝতে না পারলেও সুব্রত আর প্রিয়ব্রত বেশ বুঝতে পারছিল যে মায়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মা—বলে ওরা দুজনেই ডাকল। কিন্তু নন্দিনীই লক্ষ্য করল দুজনের গলার স্বর কেমন বিভিন্ন। সুব্রতই অনুভব করতে পারছিল যে প্রিয়ব্রত আর তার মাঝখানে সেতুটা যেটুকু ছিল তা আজ ভেঙে যাবার মুখোমুখি। প্রিয়ব্রত কত স্থির। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে।

—ডাক্তার ডাকুন।

—কথা বলতে পারছেন না, না?

—ডাকুন আপনি। সাড়া দেন কিনা দেখুন।

—মা।

বুড়ি সাড়া দিল। আর মনে হল কিছু বলতে চায়। সুব্রত মুখের কাছে কান নিয়ে গেল। শ্বাসকষ্টের মধ্যেই গোঙাতে গোঙাতে সুব্রতর মা কী বলছেন—একটু বাদে সুব্রত তা বুঝতে পারল—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। নন্দিনী যা জানে না, সুব্রত যা বিশ্বাস করে না, এবং প্রিয়ব্রতর যাতে দরকার নেই বুড়ি সেই বিশ্বাসের কথা বলছিল। নন্দিনীর মনটা টন টন করে উঠল—এই বুড়িটা হারিয়ে গেলেই এই সংসারের সুতোটা হারিয়ে যাবে।

সকালটা এল খুব বিশ্রীভাবে।

সুব্রতর কাছে মায়ের অবস্থাটা মনে হল আকস্মিক। এবং অসাময়িক। সে যেন ধারণাই করতে পারে নি যে মায়ের শেষ সময়টা এত এগিয়ে এসেছে। আর এই প্রথম প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে সুব্রতর বিরক্তি এল। প্রিয়ব্রতই যেন মায়ের জন্য শোকের আবহাওয়াকে পূর্ণ হতে দিচ্ছে না। নন্দিনী মায়ের বিছানার পাশে নতমুখে বসে। পাড়া-প্রতিবাসীরা কেউ কখনো আসছেন, যাচ্ছেন। এখনই মাকে যেন মনে হচ্ছিল কত অস্পষ্ট। সধবা, সিঁদুর-জলজলে মা, এই তো সেদিনের কথা। ছোটবেলায় জ্বরে ভুগত সুব্রত। সকালের বাসিপাট সেরে, স্নান সেরে, এলো চুলে গিঁট দিয়ে মা এসে

সুব্রতর শিয়রে দাঁড়াত। ঠাণ্ডা হাতখানা সুব্রতর কপালে রাখত মা। তার মনে হত জ্বর বুঝি নেমে গেল। সেই মাকে যেন অনেকদিন হল সুব্রত হারিয়ে ফেলেছে।

—এই ইঞ্জেকসনটা কিনে আনুন।

—ডাক্তার, কী বলে।

—ঠিক করে কিছু না।

খুব নিচু স্বরে মৃদু বিলাপের মতো হরি ওম্ শব্দটা ভেসে আসছে। মা হয়তো গভীর যন্ত্রণা পাচ্ছে। কিম্বা স্মৃতির সবটুকুই হয়তো এখন বিলুপ্ত। মা কি জানে যে প্রিয়ব্রত আর এখানে থাকবে না। সুব্রতর জন্য কি মা আর কোনো বেদনা বোধ করছে? হঠাৎ সে যেন কেমন একটা অকৃতার্থতা দ্বারা আক্রান্ত হল। সে কি মাকে সুখী করতে পারত অথচ করল না? প্রশ্নটা নিরুত্তর হয়ে গলার কাছে বেধে রইল।

এ বেদনা আজ প্রথম দেখা দিল না। ইউ. জি.-র গোপনচারী দিনগুলোয়, জেলখানার রাত্রিতে, আরো অনেকদিনের রাতে—কাজে অকাজে এই বেদনার সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়েছে। কিন্তু সে তাকে আমল দেয় নি। আজ যেন মনে হল 'ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া' অনেক ছোট-খাট জিনিস সে হারিয়েছে, যেগুলোকে ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা ছোট নয়। অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে প্রিয়ব্রত ঢুকল। নন্দিনী জল গরম করছে।

—আর কথা বলতে পারছেন না, শুধু ঠোঁটটা নড়ছে।

—পা-দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

কী আশ্চর্য তবু তার অনুভূতিটা এত ভোঁতা কেন? বোধ হয় এইজন্যে যে তার মা তার জন্যে কোনো আবেগ আর ইদানীং অনুভব করত না। তাই বোধ হয় তারও কোনো আবেগ নেই। প্রিয়ব্রত গেল কাছের একটা বাড়ি থেকে কলকাতায় ফোন করতে। প্রিয়ব্রত নিজের কাছে অন্তত একথা বলতে পারবে যে একটা দিনের অনেকগুলো জরুরী কাজ মায়ের জন্য নষ্ট করল। সুব্রতর বলার কিছু নেই।

নন্দিনী নিষ্ঠুরের মতো একান্তভাবে কামনা করছিল যেন তার বুড়ি শাশুড়ি এ অবস্থাতেও টিকে থাকে। অনেকদিন। যেন কিছুতেই প্রিয়ব্রতর মুক্তি না আসে। কলকাতায় যাওয়া যেন তার না হয়। দিন গড়িয়ে যেতে

লাগল। কে বলল—ইন্‌জেকসনের কোনো রেসপন্‌স নেই। উনুনে আজ আঁচ পড়ে নি। বাড়িতে আজ বাসিপাট সারা হয় নি।

আর সুব্রতর মা—তিনি তখন ওপারের জন্যই ব্যস্ত।

গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম উচ্চারণ করতে করতেই তিনি অনুভব করলেন বাকরোধ হয়ে আসছে। চেতনা তখন সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে শেষবারের মতো দুলছে। অনেকদিন হল, সুব্রত জন্মাবার আগে তিনি স্বামীর সঙ্গে একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। সমুদ্র বড়ো ভালো লেগেছিল। কানে বাজছে সেই অনেকদিন আগে শোনা সমুদ্রের ডাক। নন্দিনী স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম করছে। হঠাৎ তেল ওঠায় মুখ আটকে স্টোভটা নিবে গেল। নন্দিনী পোকার এনে স্টোভের মুখটা খুঁচিয়ে আবার জ্বালিয়ে দিল। সোঁ সোঁ শব্দটা ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আর কিছু মনেও পড়ছে না। শুধু কারা যেন শব্দবিহীন পায়ে চলাফেরা করছে। কথা বলছে বোবা গলায়। কে বললে—গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা।

নন্দিনী খুঁজতে গেল। পেল না। শাশুড়ির কমণ্ডলুটা শুকনো। তুলসীপাতা হয়তো এ বাড়িতে না মিললে পাশের বাড়িতে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ সময়ে কেউ বুঝি দেয় না কিছু। কাজেই গঙ্গাজল তুলসীপাতা ছাড়াই সুব্রতর মাকে চৈতন্যের সীমা পেরিয়ে যেতে হল।

তখন আর তিনি সুব্রতর মা নন, প্রিয়ব্রতর মা নন, তখন তিনি মাত্র একটা জীব-দেহ। মাতাল নদীতে নোঙরটা ছিঁড়ে যাবার আগের যন্ত্রণাই তখন মুখ্য। কে যেন কবে নন্দিনীকে বলেছিল যে জন্মের যন্ত্রণা আর মৃত্যুর যন্ত্রণা দুইই সমান দুঃসহ। উপক্রমণিকা আর উপসংহারে এই যন্ত্রণার মিল। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস অনিয়মিত হয়ে যেতে লাগল।

যেন কোনো জটিল জঙ্গলে কেউ হারিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সূর্যালোকের দেখা পেলে সেই পথিক চেঁচিয়ে উঠছে—সাড়া দিতে চাইছে দূরের সঙ্গ-ছুট মানুষদের। তারপরেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে গভীর জঙ্গলে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস বিলম্বে মুক্তি পেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে প্রাণের অস্তিত্ব। তা না হলে সীমারেখাটা প্রায় অস্পষ্ট—আর মুছে যেতে বুঝি দেরি নেই। যে মরে সে ছাড়া আর সকলেই অকিঞ্চিৎকর।

সুব্রতর মনে হল এই দীর্ঘতম নিঃশ্বাস সেই মহিলার জীবনের দীর্ঘতম ক্লান্তির চিহ্ন। নীরবে দেখল সুব্রত মা অস্তিত্বের অপর পারে চলে যাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ওর মনে হতে লাগল মৃত্যুর মতো হিংস্র আর কিছু নেই। দিন শেষ হয়ে এল। বিকেলের ছায়া পড়েছে উঠোনে। একটা কেমন যাই-যাই ভাব জেগেছে যেন।' সুব্রতর মনে পড়ল জেলখানার দিনগুলোর কথা। ঠাণ্ডা লোহার গরাদে মাথা চেপে ধরে মায়ের ঠাণ্ডা হাতের কথা ভেবেছে কতদিন। কতদিন সিপাইয়ের লোহার নাল-দেওয়া জুতোর খট-খট শব্দ ঘুমের মধ্যে মায়ের কাসির শব্দ বলে ভুল হয়েছে।

দু-ফোঁটা জল মায়ের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। নন্দিনীর দু-চোখে জল। শেষতম মুহূর্ত সমাসন্ন। ওষুধের গন্ধ—ইঞ্জেকসনের ভাঙা এ্যামপুল। ঘরটার অন্যত্র কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। ঘড়িটা ঠিক সময় দিচ্ছে। বিকেল হয়েছে। পশ্চিমের ঘুলঘুলি দিয়ে শেষ রোদের টুকরো ঘরের মধ্যে এসে ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিল। এইবার মুছে গেল, পাঁচটার বাঁশি বাজল চটকলে।

সুব্রত দেখতে লাগল শেষ নিঃশ্বাসের স্পন্দন। প্রিয়ব্রত মায়ের কানে কানে বলল—হরের্নামৈব কেবলম। সুব্রত ও-সব মানে না। বিচ্ছিন্নের মতো দেখতে লাগল।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় সুব্রতর মা মারা গেল। আশ্চর্য তার তো কান্না এল না।

এমন আবেগহীন শোকের দৃশ্য সে কখনো দেখে নি। মৃত্যু এল বিকেল পাঁচটার ঘরে-ফেরা কেরানির মতো অভ্যস্ত পদক্ষেপে—এর এমন একটা গড়পড়তা রূপ হতে পারে সুব্রত কখনো ভাবে নি। নন্দিনী কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল। প্রিয়ব্রত গেল শববাহীদের ডেকে আনতে। আর সুব্রতর মা নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। ছেলেদের কোনো ব্যাপারে মা কোনোদিন কথা বলে নি—আজকের এই চূড়ান্ত না-বলাটা যে তার থেকে পৃথক এটা সুব্রত ভাবতে পারল না। রুক্ষ চুল, বসে-যাওয়া চোখের কোল, এলিয়ে-যাওয়া শাড়ি জামায় অভুক্ত অস্নাত নন্দিনীর চেহারাটা শোকের নয়, দুর্ভোগের। ভোগান্তির। সম্পর্কের সূত্রটা স্বাধীনভাবে জন্মায়, তার শিকড়ে রসের ঘাটতি হলে সে নিঃশব্দে মরে যায়। রমেনের মৃত্যুসংবাদ তার কাছে অনেক বেশি আঘাত হেনেছিল। অথচ রমেন তার কে? সুব্রত যদি ঠিকমতো অনুভব করতে পারত যে এ বাড়ির তুলসীমঞ্চের গোড়ায়

প্রদীপ জ্বালানো সত্যিই শেষ হয়ে গেল—এরা কেউ যদি সে কথা অনুভব করত তাহলে তাদের শোকের ভিতর দিয়েই তার মা জীবিত হয়ে উঠতে পারত। তা হয় নি। মায়ের শারীরিক যন্ত্রণায় নন্দিনীর চোখের জল তো সাধারণ সহানুভূতি।

শ্মশানঘাটে শবাগ্নির আলোয় ডোমগুলোর উকুন-বাছা দেখতে দেখতে, কুকুরগুলোর ভীতিকর স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রত সেই কথাই শান্তনুকে বলছিল। শান্তনু খবর পেয়ে এসেছিল।

—এটা কেন হচ্ছে যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছি না?

—বোধ হয় আমাদের বয়স অনেক বেড়ে গেছে এটা আমরা জানি না।

—তা নয় শান্তনু, আমাদের আশা করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে বলেই আঘাত পাবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে।

—কেন আশা করার ক্ষমতা নষ্ট হল?

—সম্ভবত আমরা সব কিছুর মূল্য যাচাই করে ফেলেছি। আমাদের কাছে পরম্ বলে আর কিছু নেই।

—কিন্তু আমার মায়ের মূল্য তাতে আমার কাছে কমে গেল কেন?

—মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল কোথায়? মায়েরা যে ভাবে বাঁচতে চান সে বাঁচার সঙ্গে আমাদের বাঁচার মানে বলতে যা আমরা বুঝছি তার মিল কোথায়?

—এ অসঙ্গতির জন্য দায়ী কে?

—যতক্ষণ না আমাদের বাঁচার মানেটা ঠিক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ আমরা দায়ী।

মায়ের শবদেহটা পুড়ে যাচ্ছে। শ্মশানঘাটের মিউনিসিপ্যালিটির আলোটাকে ঘিরে অগুণতি পোকা। আধ-পোড়া কাঠের মোটা ডালের ওপর বসে বসে সুব্রত মাংস-পোড়া চিমসে গন্ধটাকে বারে বারে বুকে টেনে নিতে লাগল। মাথার খুলিটা ফাটানোর শব্দ, পা-দুটো দুমড়ে আগুনে পুরে দিতে দিতে শ্মশানবন্ধুদের হাসির শব্দ, গঙ্গায় ভারি নৌকার দাঁড় টানার শব্দ—সুব্রত আর শান্তনু নিজেরা নিঃশব্দ হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত কাগজ-কলম নিয়ে কী একটা হিসেব করছে।

শুধু তার পরের দিন রাত্রে কম্বলের বিছানায়, মাটির ওপরে শুয়ে, এপাশ ওপাশ করতে করতে, থানার পেটা-ঘড়ির আওয়াজ শুনে শুনে ক্লান্ত

সুব্রত ঘুমুতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ ডুবে যেতে লাগল একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতায়, তখনই সেই দূরে দূরে কুকুর-ডাকা, মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ ভেসে-আসা বিজন রাত্রে সুব্রত অনুভব করল তাকে ঘুম পাড়াতে পারত যে কাসির শব্দ, সেটা আর নেই।

সুব্রত অনেকক্ষণ কিছু ভাবল না। উঠে গিয়ে ও ঘরে দাঁড়ালে যেন এখনো সে একটা অস্তিত্বের সৌরভ পাবে। হ্যাঁ—শান্তনু ঠিক বলেছে। আমার মা বাঁচা কথাটার একটা মানে জানত। আমি সে মানেটা মানি নি। নিজে কোনো মানে জানিও না। আমরা তার কাছ থেকে দূরে সরে এলে সে অভিমানে বোবা হয়ে থেকেছে। আজ সুব্রতরও অভিমান হল। চলে যাব। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। প্রিয়ব্রতরাও যাবে। আমার নিজের মানে আমাকে খুঁজতে হবে। সুব্রতর মা কেন সুব্রতকে তাঁর কথা বোঝাতে চান নি—কেন সে-ই মাকে জানাতে চায় নি তার সবকিছু। এমনি করেই সে কখন হারিয়ে ফেলেছে তার আবেগ। পাতা-শিরশির হেমন্তের রাত্রি সুব্রতর কাছে উত্তপ্ত হয়েই রইল।

কম্বলের বালিশ থেকে নন্দিনীর মাথাটা সরে গিয়েছিল। রুক্ষ এলো চুল মাটিতে পড়ে। নন্দিনী স্বপ্ন দেখছিল। কারেন্ট ফেল করেছে। লিফট মাঝখানে আটকে গেছে। লিফটম্যান নেই। ভয়ে উদ্বেগে নন্দিনীর শিরদাঁড়া বরফের মতো জমাট হয়ে গেছে যেন। ও কত চিৎকার করছে। ওপরের প্যাসেজে কত লোক কথা বলছে, যাতায়াত করছে। আর্দালিকে ডাকার জন্য বাজার-টা ঝিঁঝিঁয়ে উঠছে। কিন্তু কেউ একবার খোঁজও করছে না নন্দিনী কোথায়। গলা ভর্তি হয়ে যেতে চাইল কান্নায়। কেউ কি নেই—কেউ না? ফুঁপিয়ে উঠল ও। ঘুমের ঘোরে বিশ্রী আর্তনাদ করে ফেলল। চমকে উঠে পড়ল প্রিয়ব্রত। ওই ঘরের মেঝের ওপরেই আলাদা বিছানা পেতে প্রিয়ব্রত ঘুমোচ্ছিল। উঠে দেখল নন্দিনীর মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেছে। চিৎ হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে শুয়ে আছে ও। আস্তে আস্তে নন্দিনীকে ডেকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিল প্রিয়ব্রত। গায়ে হাত দিয়ে দেখল ঘেমে ভিজে গেছে নন্দিনী। তারপর প্রিয়ব্রত আবার নিজের বিছানায় ফিরে গেল। নন্দিনীর ঘুম ততক্ষণে ভেঙে গেছে। তবু ও কিছু সাড়া দিল না। অনেকক্ষন বাদে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে এল। বুঝল আর ঘুম আসবে না। দেখল প্রিয়ব্রত আবার

ঘুমোচ্ছে। সুস্থ ক্লান্ত মানুষের মতো। তারই কোনো ব্যর্থতা নেই। কোনো কাঁটা নেই। সফল মানুষের মতো সে তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন যা করবার ছিল করেছে। আবার আগামী কাল যা করবার তা করবে। নন্দিনী প্রিয়ব্রতর মাথায় একবার হাত রাখল। সান্নিধ্য শুধু অবজ্ঞার নয় ভালোবাসার জন্মভূমিও বটে। আর কিছু কিছু কাজের কথা নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার মাসখানেক বাদে নন্দিনী সুব্রতকে বলল প্রিয়ব্রতর কথা।

—তুমি কী বলছ?

—আমার পরামর্শ শোনার জন্য সে এ-কথা তো বলছে না।

—আমায় তাহলে কি বলতে বলছ?

—সে তো আপনিই জানেন।

—প্রকৃতপক্ষে আমার তো কিছুই বলবার থাকতে পারে না।

—কেন?

—প্রিয়ব্রত যে কলকাতায় শিফট করতে চাইছে সে সম্বন্ধে অযাচিতভাবে আমি কী বলব?

—অযাচিতভাবে কেন? আপনি তো দাদা।

—এই কথাটার কোনো মানে হয়? আমি দাদার ভূমিকা কোনোদিন জানতে চাইলাম না, আজ হঠাৎ দাদা বললে ও শুনবে কেন?

—আমি তাহলে কী করি?

—নন্দিনী, প্রত্যেককেই তার নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে। তোমার যদি এ-সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে বলে মনে হয়, তুমি করবে।

—বেশ, আমি যা ঠিক করেছি তা আপনাকে বলে রাখি। আমি চাকরি ছেড়ে দোব ভাবছি। ও চেঁচামেচি করবে। সে সময়টা মামার ওখানে গিয়ে থাকব।

—আবারও বলছি এটা তোমারই ব্যাপার। শুধু একটা কথা জানার আছে আমার। জান কি প্রিয়ব্রত বাড়িটা সম্বন্ধে কী ভাবছে?

—আমাকে বলে নি কিছু।

নন্দিনী যেন একটু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। সুব্রত এমন নিস্পৃহভাবে কথা বলবে এ-কথা নন্দিনী ভাবে নি। সুব্রত নন্দিনীর বিরক্তিতেও বিস্মিত

হল না। ভাবল প্রিয়ব্রতকেই জিজ্ঞাসা করবে। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় সুব্রত প্রিয়ব্রতকে একা সুযোগমতো পেল। কথায় কথায় কথাটা উঠল। প্রিয়ব্রত বলল—দুটো ব্যবস্থার যে-কোনো একটা করা যায়। এক নম্বর, বাড়িটার গোটা নিচের তলা ভাড়া দেওয়া যায়। এখন বাড়িভাড়ার রেটও চড়া। সেটা তোমার দিক থেকে ভালো। কেননা তোমার কোনো স্থায়ী আয় নেই। আমি চলে যাচ্ছি। কলকাতায় তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না নিশ্চয়।

—না।

—এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও হবে না। কাজেই ওটা হলেই ভালো হয়। তবে তাতে আমি কিছু লাভবান হই না। দু-নম্বর হচ্ছে—বাড়িটা বেচে দিলে অনায়াসে ভালো দর পাওয়া যাবে। তোমার শেয়ার তুমি নিলে। আমারও কিছু হার্ড ক্যাশ দরকার—সব দিকেই সুরাহা হয়। তবে সেটা—

—তুমি এখানকার বাস ওঠাবে এটা কি স্থিরই করে ফেলেছ ?

—প্রায়। নন্দিনী গাঁইগুঁই করছে। ছাট ইজ সিলি। আমার কলকাতা না গেলে চলবে না।

—সে ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে বেচেই দাও।

প্রিয়ব্রত একটু বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্ময়টা প্রকাশ করল না। মুখে বলল—তাহলে দালাল লাগাই।

কিন্তু নন্দিনী বাধা দিল। দিনকতক অপেক্ষা করে থাকার পর সে কথা বলল।

পরিষ্কার গলায় প্রিয়ব্রতর এই মনোভাবকে সে স্বেচ্ছাচারিতা বলে অভিহিত করল। এবং এও বলল যে তার সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রিয়ব্রতর এমন পদক্ষেপের কোনো অধিকারই নাকি নেই। প্রিয়ব্রতর অসুবিধা হল এই যে নন্দিনীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় সে নন্দিনীর মতো নিরুত্তাপ থাকতে পারে না। নন্দিনী কখনো নিষ্ঠুরের মতো প্রিয়ব্রতর সমস্ত আচার-আচরণকে আঘাত করতে লাগল। কখনো অনুনয়ের সুর আনল গলায়। সেদিন প্রিয়ব্রত বলল—কিন্তু তুমিও তো আমার অংশীদার, আমার সঙ্গে সহযোগিতার দায় থেকে তুমি মুক্তি পাও কী করে ?

নন্দিনী বলল—মুক্তি পেতে চাচ্ছি না, যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করতে চাচ্ছি।

প্রিয়ব্রত বলল—ননসেন্স।

নন্দিনী বলল—না, ননসেন্স নয়। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম। লোভ যেটুকু আমার সেটা এইটুকুই। তুমি মেয়ে হলে বুঝতে এটা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু আমি যেটা বুঝি নি সেটাই অপরাধ, সেটা হল তুমি আমাকে চাও নি।

—বাজে বোকো না নন্দিন।

—বাজে বকছি না। তুমিই বুঝছ না। আমি যদি তোমার সব কথা মেনে নিতে পারতাম তাহলে একরকম হত। কিন্তু আমি মানতে পারছি না আর তুমি জোর করছ, এটা মেনে নোব কেমন করে। তুমি জানো না তাতে আমার অপমান হয়।

—কেউ বোকার মতো এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না আজকাল।

—আমি তাহলে আজকালের নই। তুমি শুনেছ, বলেছি আমার মা বলেছিল যে—

—থামো, আমি অনেক শুনেছি ও-সব গল্প। আজকের দিন হলে লোকে কী বলত তোমার মাকে জানো ? বলত শি ইজ এ ফুল।

নন্দিনী মশারি সরিয়ে বিছানার বাইরে চলে এল। তারপর সারারাত্রি বসে বসে কাঁদল। প্রিয়ব্রত এগুলোকে স্বাভাবিক বলে মনে করে স্বাভাবিভাবে ঘুমোল। প্রিয়ব্রতর প্রাত্যহিক কাজেকর্মে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এ-কথা মনে করার কোনো হেতু দেখা গেল না। যথানিয়মে তার অফিস যাওয়া, যথাপূর্বং দেরি করে ফেরা। মনে হয় নন্দিনীর সঙ্গে তার বিতণ্ডার ব্যাপারটাকে সে দৈনিক প্রোগ্রামের মধ্যে ধরে নিয়েছে। কাজেই দিনের পর দিন, প্রায় প্রতি রবিবারে দালাল আসতে লাগল। একো জনা খদ্দের বাড়িটার একোরকম অসুবিধা আবিষ্কার করল। প্রিয়ব্রত এবং সেই দালাল ভদ্রলোক বাড়িটার সুবিধার সংখ্যা শততম থেকে সহস্রতম করে তুলল। নন্দিনী এবং সুব্রত দুজনে দুই প্রান্তের সাক্ষী হিসাবে নীরব রইল।

সেদিন রবিবার। সুব্রত বাড়ি নেই। নন্দিনী সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর প্রিয়ব্রতকে বলল আজ বিকেলে চল আমার সঙ্গে। একটু

বেড়িয়ে আসি। এবং প্রিয়ব্রত রাজি হওয়াটাকে কৌশল ভেবেই রাজি হল।

নন্দিনী সুন্দর করে সাজল। সাধারণত আজকাল অফিস যাবার আগেই সাজে। বাড়ি ফিরে সাজের বোঝা খসাতে পারলেই সে যেন বাঁচে। আজ প্রিয়ব্রতর জন্য আলাদা করে সাজল। নিচু-কাটের ব্লাউজ় পরল—লম্বা হাতা। বুকের দিকে তাকালে পথিক নিজেকে অপরাধী মনে করবে এমন কাটের, শাদা রঙের ওপর কালো বুটির ব্লাউজ। হার-লকেট সরিয়ে ফেলে খালি রাখল গলা। মনিবন্ধে ঘড়ি বাঁধল না। শাশুড়ির দেওয়া বালা দুটো পরল। লেস-বসানো সায়াটা পরতে পরতেই ভেবে নিল—নতুন তাঁতের শাড়ি নয়—ফুলে ফেঁপে থাকবে—ফিকে নীল পাইপিং পাড়ের জর্জেট আঁকড়ে ধরুক শরীরটাকে। চোখের কোলে আলতো করে কাজল ছোঁয়াল। টিপ দিল না ছোট্ট কপালে। তারপরে প্রিয়ব্রতকে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে নিয়ে বলল, চল। মাথায় ভালো করে চুল ওঠে নি তখনো প্রিয়ব্রতর। ধুতি পাঞ্জাবীতে একটু রুগ্ন দেখাচ্ছিল। তাহলেও ভালোই লাগল।

—কোথায়?

—ওপারে, চার্চে বেড়িয়ে আসি চল। বাসে উঠে নৈহাটী যাব। নৈহাটীর ফেরিঘাটের লঞ্চে ভীড় ছিল না। চুঁচুড়ার গঙ্গার গলাগলি রাস্তাও ছিল পাতলা। ওরা হাঁটল। কথা বলল পুরনো দিনের মতো। ডিস্ট্রিক্ট জেলের ফটকে পুরনো অকেজো কামানের সামনে ছেলেমানুষের মতো নন্দিনী দাঁড়াল। জুবিলি ব্রিজ দিয়ে গাড়ি যাওয়া দেখল। চার্চে যখন পৌছল তখন ভরা বিকেল। অনেক ছেলে। অনেক মেয়ে। পশ্চিমের রোদ ওপারের কারখানার চিমনির মাথায়। কেউ বসে গল্প শুনছে। কেউ শাড়ির নিচের দিকের ভাঁটুই বাছতে বাছতে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করছে। বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে নন্দিনীর বুকটা দুলে উঠল। বিয়ের আগে ওরা একবার এসেছিল এখানে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বসেছিল দুজনে। একটা তিনশ বছরের পুরনো জাহাজের মাস্তুল চার্চের এককোণে রাখা আছে। সেটাকে আর একবার দেখতে গিয়ে নন্দিনীর একটা বিচিত্র কথা মনে হল—তিন শ বছর কতদিন? এই সেদিনের চেয়েও কি সেদিন পুরনো হয়ে গেছে? গঙ্গার জলের কাছাকাছি গিয়ে বসল ওরা। ঢেউ নেই। নিথর গঙ্গা। হাওয়া নেই। স্থির গাছপালা। হেমন্তের দেরি নেই। আকাশ ফাঁকা। পালে বাতাস নেই।

—তোমাকে একটা কথা বলব? গলা কাঁপছে নন্দিনীর।

—বলো।

—কী হবে আমাদের অনেক টাকা হয়ে? নাই হল অনেক কিছু?

—কী হবে তাহলে জানো?

—দুঃখকষ্টের সংসার। দু-একটা ছেলেমেয়ে। তুমি অফিস করবে। আমি সংসার করব।

—কী লাভ এমন করে বাঁচায়?

—দু-জনে ভালবাসতে পারব দু-জনকে, দু-জনের ছেলেমেয়েকে। আমি সংসার করতে চাই।

—নন্দিন, আমিও তো তাই চাই।

—তাহলে? একটা ঘাসের পাতা দাঁত দিয়ে কাটল নন্দিনী।

—ঠিকমতো বাঁচতে চাইব না আমরা?

—ঠিকমতো বাঁচতে চাওয়া মানে কি কেবল এই ছোটা, এই বুঝি অন্যে পেয়ে গেল সব, আমি হারালাম এই ভয়?

—আর দুটো বছর—বিড়বিড় করল প্রিয়ব্রত। প্রায় মিনতির স্বর আনল গলায়। আর দুটো বছর দিতে পার না নন্দিন?

চুপ করে বসে রইল ওরা। প্রিয়ব্রত কথা বলতে লাগল মাঝে মাঝে, গঙ্গার জলে মাটির ছোট ছোট টুকরোগুলো ফেলতে ফেলতে।—বাবা মারা গেল হঠাৎ। এক পয়সার সংস্থান নেই। সম্বলের মধ্যে ছিল বাড়িটা। অথচ বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন বাড়িটায় উৎসব যেন লেগেই থাকত। বড় বড় গানের আসর। খাওয়া-দাওয়া। শেষ যখন হল তখন একটু রেশও বাকি থাকল না। "তুমি দেখ নি আমাদের সে-সব দিন। দাদা ভালো ছাত্র, পড়ার খরচ লাগে নি। পার হয়ে গেল। আমি মিডিওকার। উদয়াস্ত টুইশনি করে নিজের চরকায় তেল দেবার সময়ই পাই না। একটা বাইরে বেরুনোর সার্ট। নিজেই কেচে নিতে হয়। সব কিছু আমার ঘাড়ে—কোনোদিকে কোনো সুরাহা নেই। খেটে খেটে, না খেয়ে মা অসুখে পড়ল। দাদা পার্টি নিয়ে মেতে রইল। সিলি। তুমি জান না এ-সব, আমার এক কাকিমা থাকেন কালিঘাটে। এক-আধদিন সেখানে গেছি। ধোঁয়ায় কালো তক্তাপোষ। স্তূপাকার বিছানা। চায়ে-ভিজানো মুড়ির ব্রেকফাস্ট। বার্লি-ওয়াটারের মতো ডালের জল। মাসের দশ তারিখ থেকেই সেখানে শেষ মাস

শুরু হয়। কথা হারিয়ে যায়—হরিব্‌ল।" মাটি টুকরোটা জলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতের ময়লা ঝেড়ে ফেলল প্রিয়ব্রত।

—এ-সবের ছবি তো আমারও অজানা নয়। নন্দিনী বলল।

—তাহলে?

—আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি, তাহলে কী হয়েছে?

—তোমার খুব সাহস, না?

—আমি মনে করি টাকা নেই এই যা, নইলে আমরা সত্যি সত্যি গরীব নই; সাহসের কী আছে আর বলো, তবে এটা ঠিক তুমি কিন্তু বড্ড ভীতু।

—হ্যাঁ নন্দিনী, আমার বড় ভয় করে। গরীব হয়ে যেতে বড় ভয় করে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। এবার উঠতে হয়। অনেকেই ঘর-ফিরতি। প্রাচীন গীর্জার প্রাঙ্গণে নেমে আসছে একটা বিষণ্ণ নির্জনতা। ওরা দুজনে উঠে পড়ল। নন্দিনীর মুখখানা যেন ভেঙে চুরে গেছে। মীমাংসা হল না কিছু। প্রিয়ব্রতর যেন লজ্জা করছে নন্দিনীর দিকে তাকাতে। এ ভাবল না এলেই হত, ও ভাবল আর কখনো আসব না। রাস্তার আলো জ্বলেছে। ও পারের আকাশ ম্লান। কে একজন ওদের দিকে এগিয়ে এল। প্রিয়ব্রত বলল—শান্তনুবাবু। নন্দিনী শান্তনুর কথা শুনেছে সুব্রতর কাছে। শাশুড়ীর মৃত্যুর দিন শান্তনু এসেছিল শ্মশানে, প্রিয়ব্রত বলেছিল সে কথা। কিন্তু এই মন-বিকল সন্ধ্যায় এই দাড়ি-গজানো রুক্ষ চেহারার যুবককে নন্দিনীর ভালো লাগল না। একটা নিঃসাড় হাসি হাসবার চেষ্টা করল শান্তনু। প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞাসা করল—বেড়াতে এসেছেন? প্রিয়ব্রত বিনীত হাসি দিয়ে বেড়াতে আসার গৌরবকে হাল্‌কা করল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করল—আপনি?

শান্তনু বলল—ঘুরে বেড়াচ্ছি।

নন্দিনী বলল—আমরা শুধু বেড়াচ্ছি।

হেসে ফেলল শান্তনু। নন্দিনী দেখল হাসলে শান্তনুকে ততটা উজবুক বলে মনে হয় না। শান্তনু মন্তব্য করল—ঘুরে বেড়ানো আর শুধু বেড়ানোয় অবশ্যই অনেক তফাৎ। এবং ঘুরে বেড়াতে কেবল আমার মতো লোকেরাই পারে?

— কেন? নন্দিনীর মুখও একটু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কিছু করার নেই বলে।

তারপর প্রসঙ্গটাকে পরিহার করে শান্তনু অন্য কথায় গিয়ে দাঁড়াল।—আমি অনেকক্ষণ আপনাদের লক্ষ্য করেছি। তখন দেখলাম আপনারা···

প্রিয়ব্রত বলল—ঢেউ গুণতে চাইছিলাম। সকলে হেসে উঠল। শান্তনু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—না ঠিক তা নয়, কথা বলছিলেন আপনারা—

—ও মা তাতে কী, আপনি এলে আপনিও কথা বলতেন।

একটা খালি রিকসা যাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত থামাল রিকসাটাকে। ওদের রিকসায় তুলে দিতে দিতে শান্তনু বলল—খুব ভালো লাগল আপনাদের দুজনকে দেখে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়, আজ সারাদিন কেবল কান্নাকাটি দেখেছি। আমাদের স্কুলের এক সহকর্মীর স্ত্রী আজ মারা গেলেন। (ও মা) ভুগছিলেন অনেকদিন। কাঁচড়াপাড়া টি. বি. হসপিটালে ছিলেন। (ভেরি স্যাড) সাতদিন ধরে দিন-রাত্রি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। গিয়েছিলাম সেখানে। লাস নিয়ে আসা, বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাগুলোর কান্নাকাটি সামলানো—(ইস্) ঝামেলা গেছে সারাদিন। এবং স্বভাবতই মেজাজটাও কেমন যেন ছানা কেটে গেছে। ওখানে সুব্রতদের পেলাম না। কী করি—এ পারে চলে এলাম। এখানে আপনাদের দুজনকে দেখে বেশ ভালো লাগল। আচ্ছা—আর আটকাব না। প্রিয়ব্রত হেসে বিদায়সূচক ঘাড় নাড়ল।

নন্দিনী বলল—আসবেন একদিন। রিকসা ছেড়ে দিল।

শান্তনু হাত তুলে বলল—নিশ্চয়।

চলন্ত রিক্‌সায় ঠাণ্ডা হেমন্তের হাওয়া এসে নন্দিনীর উত্তপ্ত মুখের ওপর হাত বুলিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত নিঃশব্দে সিগারেট ধরাল। পথের মোড়ে মোড়ে রোয়াকে রোয়াকে সান্ধ্য গুলতুনি। দরজায় দরজায় "আমি আর কক্ষনো আসব না," তুই যদি না যাস ভাই। নন্দিনী কিছু শুনছিল না। শান্তনু যে বলে গেল—আপনাদের দুজন—এ কথাটার কোনো মানে নেই। এ দুজন একজন এবং আর একজনের যোগফল নয়। এখানে দুই শব্দ শুধু সংখ্যা। আসলে সে একজন। প্রিয়ব্রত আর একজন।

রিকসাটা চলতে চলতে রেলওয়ে কালভার্টের তলা দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছল যেখানে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল—কোন্ দিকে যাব বাবু?

প্রিয়ব্রত বলল—সোজা।

কী দুঃসাহসী ব্লাউজ—

কথাটা শান্তনুর মাথায় হঠাৎ ভেসে উঠল।

একা একা পথ চলছিল। চুঁচুড়া লঞ্চঘাটে খেয়া পার হওয়াই সুবিধের। ট্রেনে ভাড়া চার পয়সা বেশি। হাঁটতে হাঁটতে শীত করে উঠল শান্তনুর। নিঃশ্বাসটা গরম হয়ে উঠল। মাথার দুপাশে যন্ত্রণা। শান্তনু বুঝল জ্বর আসছে। সেদিন রাত্রের মতো। লঞ্চঘাটে যখন পৌছল তখনই একটা লঞ্চ ছেড়ে গেল। স্থির জলে মোটরের শব্দটা যেন ধাবমান হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ওপারের খেয়াঘাটে দিশারী আলো। খেয়াঘাটের জেটির রেলিঙে হাত রেখে জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও দু-বার থুথু ফেলল। মুখ অসম্ভব তেতো। সারা দিনের তর্জি সারা পায়ে দাঁত ফোটাচ্ছে এবার।

—কী দুঃসাহসী ব্লাউজ। কথাটা শান্তনুর জ্বরের সুযোগ নিচ্ছে। প্রিয়ব্রত খুব সফল। সফল হলে সবই সদুপায়। নন্দিনীর বস্ত্রহরণের মালিক প্রিয়ব্রত, সেও তো সফলতা। কেমন করে নন্দিনীকে প্রিয়ব্রত পেয়েছে—সে প্রশ্ন নিরর্থক। সফলতাই জানায় যে সবই সদুপায়। ওপারে লঞ্চটা ছেড়েছে। ওটাই তার লঞ্চ। সম্ভবত শেষ লঞ্চ। খেয়াঘাট নির্জন। টিকিটবাবু ঢুলছে।

দোকানে ব্লাউজগুলো সাজায়, লক্ষ্য হল ক্রেতা। নন্দিনীর লক্ষ্য কী? শান্তনু নিজেকে তিরস্কার করল, বলল—অশ্লীল। জ্বর আসছে। প্রিয়ব্রত ইজ এ সাকসেসফুল ম্যান। জল কেটে, ঢেউ তুলে লঞ্চটা জেটিতে ভিড়ল।

দূরের গঙ্গার বাঁকে চটকলের, কাগজকলের সারি সারি বিদ্যুৎ বাতির বাহার। তার ছায়া পড়েছে জলে। বেশি ভীড় ছিল না লঞ্চে। এপারের যাত্রীও বেশি নেই। লঞ্চের এক কোণায় নিজেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল শান্তনু। আমিই কিছু হতে পারি নি। সাঁচ্চা কমিউনিস্ট হতে চেয়েছিলাম। অনেক পরের কথা। অনেক সামর্থ্য লাগে তাতে। একটা সৎ কেরানী, কি, সাঁচ্চা স্কুল-মাস্টারও যদি হতে পারতাম। স্কুলে পড়াতে গিয়ে ঘুম আসে—রাগ হয়। সফলতা—কাকে সফলতা বলে সেটা জানা থাকলেও আমি আস্তে সফল হয়ে যেতে পারতাম। টিং-টিং-টিং-টিং—লঞ্চ ছেড়ে দিল। আমি কিছুই হতে পারিনি। বাংলার এম. এ. এবং ব্যর্থ সনেট-লেখক। আমার দাদা, আমার দাদার শালা সকলেই একটা একটা কিছু হয়েছে। আর আমি সনেটের শেষ দু লাইনে মিল দিয়েই ফুরিয়ে যাব।

মেঘের মতো, গ্লানির মতো যখনই এই দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসে শান্তনুর মনে তখনই সে বোঝে তার জ্বর এসেছে। টুকরো টুকরো কথা ভাসছে লঞ্চে। "ঘোষ মিনিস্ট্রি থাকলে আর দেখতে হত না। বাঙালদেরই রাজত্ব হয়ে যেত"। "এই বা কী ভালো হল মশাই, সে না হয় বাঙালদের পোয়া বারো হত, এ হয়েছে মেড়োদের রাজত্ব"। "রায় মিনিস্ট্রির পেছনে মাড়োয়ারীরাই তো কলকাঠি নাড়ছে।" "তবু সে বাঙালদের থেকে ভালো"—"আর বাঙাল মানেই কম্যুনিস্ট।" "আরে বাঙালগুলো যদি নেড়েগুলোর সঙ্গে ঠিকমতো লড়ে যেত"…

চমৎকার…রামমোহনের নাতি-নাতকুড়েরা…চমৎকার। শান্তনু হিসেব করল—এক নম্বর এ্যান্টি-বাঙাল, দু নম্বর এ্যান্টি-মেড়ো, তিন নম্বর এ্যান্টি-কমিউনিস্ট, চার নম্বর এ্যান্টি-নেড়ে—বাঃ ভ্রাতরঃ মানবাঃ সর্বে, স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্।—জ্বর আসছে। জ্বরের ঘোর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। সুব্রত তুমি একটা ফুল। রুচিকে তুমি চেন না! ইনসারেকশনের স্বপ্ন ফেঁসে গেল, আর তুমি নিচুকাটের ব্লাউজ-ঢাকা রুচির বুকের স্বপ্নে বিভোল। রুচিকের কমরেড না তুমি?

(ক্রমশ)

দিলীপকুমার সেন

দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

মহাকাব্য

একাকী তোমার যুদ্ধে, নড়ে ওঠে সমস্ত পৃথিবী
কটাক্ষে সশস্ত্র ছটা ছুঁড়ে মারে মৃত্যুর শায়ক ;
সর্বাঙ্গে সমর বার্তা। রথ-চক্রও যদি বা দৈবী
পরাস্ত, অর্জুন হও, কুরুক্ষেত্রে ফেরারী নায়ক !
রাহুর বলিষ্ঠ যজ্ঞে থরো থরো ভয়ার্ত দ্রৌপদী
কাঁপে ! আসুরী সভায় তার রিক্ত তনুর প্রত্যাশী
অমৃতে বিষের পাত্র, ভাঙে নৃত্য দেবতারা যদি
অন্যথা অতনু জয়ী, দেখে ফেরে বিরক্ত সন্ন্যাসী।

একাকী তোমার যুদ্ধ ! শরীরে অজস্র প্রহরণ
সর্বত্র পোড়ায় অঙ্গ ; নবজাত গ্রহের যন্ত্রণা ;
থামারে বন্দরে, সীতা স্বর্ণদগ্ধ ! জটায়ু মন্ত্রণা
করে···ঘরে ঘরে, ক্রুর, অন্তরালে লেখে রামায়ণ।

ভস্ম অপমান ছাড়ো ! আদি অন্ত আণবিক প্রেম
চরম প্রশান্তি চেয়ে সেই গল্প, ঋষিরা শোনেন ॥

কোন এক শিল্পীর আঁকা ছবি

দুটি কি একটি রেখা রঙে রঙে অপরূপ তার
মুখের আশ্চর্য শিল্প খুঁজে পায় নিটোল ভূমিকা ;
দু বাহু অন্তিম হর্ষ, স্তনে লিপ্ত কণ্টকের হার
গড়নে ভাবনে পূর্ণ অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে গৌন শিখা।

সহস্র স্মৃতির দৃশ্য কাচে আঁকে সমুদ্রের পট
শিয়রে তরঙ্গ ভঙ্গ, প্রথামত অরণ্যের ঠাট ;
সে খোলে একান্তে স্বর্গ শূন্যহাতে অন্ধকার জট
দীঘল বেণীর ভাঁজে, বাঁধে বণ্যা-শস্য-জলা-মাঠ।

স্বল্পায়ু রেখায় ভাসে জন্মলীন স্বলাজ ছলনা
হয়তো স্বরূপে মুগ্ধ অথবা সে ধ্বংসের সূচনা !
সে যদি সূর্যের দাহ, মাটি কাঁপে অঙ্কুরে শিখায়
হিরন্ময় ইচ্ছা এঁকে বুকে মুখে পুষ্প হয়ে যায়।

স্বভাবে রহস্য ঘেরা প্রেক্ষাগৃহ কাছাকাছি আছে
দুচোখ নিবিড় দেখ, পোড়ে তাও অঙ্গারের আঁচে।

শিবশম্ভু পাল

কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতিতে

এতখানি ভালোবাসা তোমাকে দেখার আগে দেখি নি, দিলীপ।
চৌরঙ্গীর ফুটপাথে, কফিঘরে, অথবা, হাওড়ায়
তোমার নির্জন ঘরে সর্বদাই তার কথা বলেছ সর্বদা ;
রাজনীতি, সম্পাদক, মহিলা—এসব নয়, কেবলই কবিতা !
এ এক অবাক করা স্ত্রৈণতায় তোমার নীলাভ চক্ষু দীপ্যমান ছিল।
আবেগে কণ্ঠের সঙ্গে কেঁপে উঠত পাণ্ডুলিপি থরথর করে,
কপালের শিরা তিনটে তরঙ্গের মতো যেন নেচে উঠত। আমি
এতখানি ভালোবাসা তোমাকে দেখার আগে দেখি নি, দিলীপ।

দীর্ঘদিন অদর্শন চিরবিরহের অন্ধকারে
লীন হয়ে গেল আজ। তোমাকে এখন দেখি বুকের গভীরে,
বড় স্পষ্ট বড় তীব্র ফুটে ওঠো চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে ;
ম্লান হতে ম্লানতর উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর তৈলাক্ত মসৃণ
সম্পাদকের রাস্তা, ভাড়াখাটা মননের বেণের দোকান।
তোমার স্মৃতির পার্শ্বে এরা কত দীন, কত করুণার পাত্র মনে হয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি
কে যায়? কারা? হে কারা?
মাঠের ওপারে কোদালে-মেঘের ঘাঁটি
উঠান ছন্নছাড়া।

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি
তোমার বুকের ভিতরে কে আছে? কারা?
ওদের বাগান আনন্দে পরিপাটি
মোড়ল, তোমার পাড়া?

পরাণ মোড়ল, ঐ গ্রামে ছিলে ভালো
ঐ গ্রামে ছিলো কোষাগার—রাজধানী
এখন তোমার সত্তায় অগোছালো
হরিণীর হাতছানি।

লোকে বলেছিলো—তুমি তো বিদেশ যাবে
মলাক্কা থেকে আনবে মরিচাদানা
এখন রাংতা-বিজড়িত-কিংখাবে
ডুবন্ত উইছানা!

মোড়ল, কোথায় সেই স্বাধীনতাবোধ?
কোথায় তোমার পরার্থপর প্রাণ
কোথায় তোমার স্বারূপ্য ন্যগ্রোধ
আত্মানুসন্ধান?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ

সংবাদে প্রকাশ

কে যেন ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে
গাছগুলোকে জ্যোৎস্নায়।
খুব জ্যোৎস্না হয়েছে
দৃশ্যটাকে
পরিষ্কার করে দেখাবার দরকারে।

জ্যোৎস্না।
এই মদির নামটুকু কানে রাখতে রাখতে
একটা ট্রাম আস্তে-আস্তে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
টার্মিনাসে ঢুকছিলো।
ঠিক তখনই, হঠাৎ,
সেই লাইনবদলের মুখেই
দেখ্ দেখ্ করতে-না-করতেই
হাড়গোড়সুদ্ধ্ কাটা পড়লো
কলকাতা।

কাছেই স্টপেজে
লাস্ট বাসের টোপ ফেলে বসেছিলো কিছু লোক
তারা সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেও
এক পা নড়লো না।
যারা ইতিমধ্যে ভিড় করেছিলো
তাদের কয়েকজনকে তদন্ত করবার জন্য
ছড়িয়ে দিয়ে,
আরেক দল একটা বিহিত করতে
দৌড়ে চলে গেল উল্টোদিকে।

ভাবছিলাম দৌড়বো নাকি উল্টোদিকে,
আমার কানে-কানে কে যেন ভিড়ের মধ্যে,
ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্র পড়লো, আত্মহত্যা নয়তো !

ঘোলাজলের বড়ো-বড়ো হাইড্রান্টগুলো
তখনও তাকিয়ে আছে উপরে
জ্যোৎস্নার দিকে
যেখানে
ভীষণ একটা তদন্তের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিলো
তখনও।

আশিস সান্যাল

অনেক সুদূরে আরো যেতে হবে

অনেক সুদূরে আরো যেতে হবে। কেননা হৃদয়
নিরভ্র প্রতিমা ছাড়া আর কোন নাম
দেখেনি ছ'চোখ মেলে। রঙ্গিলা বৃক্ষের মতো আরো সমুজ্জল
প্রণয় সমান দৃশ্যে ক্রমে বহমান
রঞ্জিত আস্বাদ কিছু নিতে হবে। এখনো তন্ময়
প্রকৃত ফুলের চেয়ে কোনোদিকে সহৃদয় দেখি না মহিমা।

অনেক বিহ্বল দেহে নক্ষত্রের উজ্জ্বল দেখেছি। অনেক নদীর
উন্মোচিত জলস্রোতে ভাসায়েছি বিশুদ্ধ তরণী।
তবু পলিমাটির কিছু দেখা হল না। তোমার মুখের।
রহস্যে বিনম্র ছায়া প্রবাহিত এখনো সুদূরে
অন্ধকার বনপথে সর্বাধিক উল্লসিত হে স্নিগ্ধ রমণী
তোমার প্রতিমা চেয়ে বহুকাল যেতে হবে অবিরাম উদ্ভাসিত
ব্যাপক গভীরে।

গোলাম কুদ্দুস

আর এক রমণী

যখন এক সোভিয়েত রমণী মহাকাশে পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে বেড়াতে এলেন তখন আমার আর এক রমণীর কথা মনে পড়ে গেল।

আপনি কার্ল মার্কসের সহধর্মিণী। আপনার কথা এমনভাবে আমার মনে এল কেন? মহাকাশযাত্রিনীর সঙ্গে আপনার কি যোগ?

যোগের কথা হয়তো সবিস্তারে বর্ণনা করা যেত। হয়তো এও বলা যেত যে, মার্কসের হাত ধরে আপনি যখন নির্বাসিতজীবনের অনিশ্চয়তার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন তা ছিল ইতিহাসের বিচারে আরো অপার মহাশূন্যে পক্ষবিস্তার। এর যাথার্থ্য প্রমাণ করাও হয়তো শক্ত নয়। কিন্তু এ-সব দিকে আমার মন নেই। আমি ভাবছি, এমন আনন্দের মুহূর্তে কেন আপনার জীবনের কঠিন দুঃখের দিনগুলির ছবি আমার চোখে ভেসে এল? বৃক্ষচারা যারা রোপণ করেছিল তারা আজ ফলের উৎসবে অনুপস্থিত, আমার বেদনাবোধের এই কি কারণ?

অথচ এই বেদনাবোধ কোথায় যেন এক গভীর আনন্দের সঙ্গে মিশে গেছে।

ট্রায়ার শহরের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী ছিলেন আপনি। ধনীগৃহে আপনার জন্ম। কিন্তু আপনি সে-সব বিলাস-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে মার্কসের হাত ধরে বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন অনায়াসে বিনা দ্বিধায়।

আমাদের দেশের কয়েকজন মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভের জন্য সহধর্মিনীদের পিছনে ফেলে এসেছিলেন। তাঁদের অর্ধাঙ্গিনীদের জন্য লোকের মনে আজো প্রচুর সহানুভূতি দেখা যায়। তবে এ-কথা বলতেই হবে যে, সে-ব্যাচারীদের আপনার মতো বর্হিবিশ্বে বেরিয়ে দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি। আসলে এর আগে আর কোনো বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী আপনার মতো এমন ভাবে যুগ্মজীবনের রথ চালায় নি। আপনাকে তাঁদের মতো বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতে না হলেও বিপ্লবী জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার সবটাই বুক পেতে গ্রহণ

করতে হয়েছিল। তাই ধর্মহীন হয়েও আপনিই সত্যকার সহধর্মিনী। অথচ গত শতাব্দীকাল ধরে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এই প্রচারই করা যে, তারা পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করতে চায়।

মার্কসের স্ত্রী এবং বন্ধুভাগ্য ছিল। আপনার মতো স্ত্রী এবং এঙ্গেলসের মতো বন্ধু একসঙ্গে কজনের ভাগ্যে জোটে? আপনাদের দুইজনের সাহচর্য ব্যতিরেকে মার্কস কখনো কি মার্কস হতে পারতেন না? কথাটা আর একজনের মনেও উদয় হয়েছিল। তিনি আপনার স্বনামধন্য জামাতা পল লাফার্গ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও তুলেছিলেন—মার্কসের মনকে কে বেশি বুঝতেন, এঙ্গেলস না আপনি? তাঁর রায় আপনার পক্ষেই গিয়েছিল। বলা বাহুল্য এটা স্ত্রী কর্তৃক প্রচলিত অর্থে স্বামীর মন বোঝার ব্যাপার নয়, এটা ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার মনের উপযুক্ত সহচরী হওয়ার প্রশ্ন। লাফার্গের ভাষায় "স্ত্রীর বুদ্ধি এবং সমালোচনা শক্তির প্রতি মার্কসের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি তাঁকে সকল রচনার খসড়া দেখাতেন এবং মতামতের উচ্চ মূল্য দিতেন।"

এর মূল্য যে কী, তা নতুন করে চোখে পড়ে যখন ভাবি মার্কসের দুর্যোগময় জীবনের সঙ্গিনী আপনার সদা প্রফুল্ল শান্ত মুখ তাঁকে কতটা শক্তি জোগাত। আমরা তো জানি অত্যধিক অভাব অনটনে মানুষ মুষড়ে পড়ে, সংসারে অশান্তি দেখা দেয়, প্রেমের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়, পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হয়; প্রথম যৌবনের আদর্শ এবং স্বপ্নগুলি ক্রমে মিলিয়ে আসে। মাপ করবেন, আপনাদের ক্ষেত্রে এদিক থেকেও ব্যাপারটিকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। আপনাদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা অল্পবিস্তর বহু লোকই লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আপনাদের সন্তানাদি থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমালোচক অনেকেই আছেন। তাঁরা আপনাদের নানা অবস্থায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারো লেখা পড়েই আভাসে-ইঙ্গিতেও জানা যায় না যে, আপনাদের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতম অশান্তির চিহ্ন বর্তমান ছিল। বরং তাঁদের লেখায় সরবে বা নীরবে এই সুরটিই ফুটে উঠেছে যে, মার্কস পরিবারের মধ্যে ঝর্ণাধারার মতোই স্নেহ প্রীতির স্রোত বয়ে যেত। এটা কি করে সম্ভব যদি না আপনি মার্কসের সাধনার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝে তাঁর সঙ্গে সর্বদা একত্রে আদর্শের উচ্চ শিখরে বিহার করতে পারতেন?

একবার আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, ওদের মধ্যেও তলে তলে নিশ্চয়ই কিছু ঝগড়াঝাটি হত, সে-কথা বাইরের লোক জানবে কি করে? আমি স্বীকার করছি বন্ধুর মতো অত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। ঝাপসা চোখে আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয়েছে, অভাব অনটনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন আপনার প্রাণপ্রদীপে প্রেমের শিখা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। আপনার বিভিন্ন বন্ধু এবং বান্ধবীর কাছে লেখা এই সময়কার চিঠিগুলি আমার কাছে তার প্রমাণ বহন করে আনে। আপনার কলম দিয়ে যেন কালি ঝরে নি, রক্ত ঝরেছে। কিন্তু তাতে বাইরের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের ঐশ্বর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার কাছে তাই চিঠিগুলির এত দাম।

পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিজের জীবনের দারিদ্র্য বর্ণনা কত কঠিন তা ভুক্তভোগীরাই জানে। কজন এমন করে পারে? হয় তারা দুঃখ চেপে যায়, নতুবা মানসিক দৈন্য প্রকাশ করে। কিন্তু জোসেপ ওয়েডমেয়ারের কাছে লেখা আপনার নিম্নোক্ত পত্রে কি দেখতে পাচ্ছি।

"অবস্থার গতিকে আমি কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। আপনার কাছে আমার নিবেদন, পত্রিকার আয় থেকে যতটুকু অর্থ পাঠানো সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠান। আমাদের টাকার দরকার—খুবই দরকার। আমরা আত্মত্যাগ করেছি বলে হৈ-চৈয়ে মেতেছি, এমন অপবাদ নিশ্চয়ই কেউ দিতে পারবে না। জনসাধারণকে কখনো আমরা আমাদের অবস্থার কথা জানতে দিই নি। আমার স্বামী এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সে বরং চূড়ান্ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত, কিন্তু কিছুতেই নামজাদা 'মহাপুরুষ'দের মতো গণতান্ত্রিক ভিক্ষার পথ গ্রহণ করবে না।

"আমি আপনার কাছে আমাদের জীবনের একটি দিনের বর্ণনা দেব। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তাই জানাব। আপনি লক্ষ্য করবেন, এমন বিপাকে সম্ভবত খুব কম বাস্তুহারাকেই পড়তে হয়েছে। এখানে আমার খোকাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য ধাই রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আমার বুকে পীঠে সাংঘাতিক ব্যথা, এক মুহূর্ত তা থেকে পরিত্রাণ নেই, তবুও আম ঠিক করেছিলাম খোকাকে আমি আমার বুকের দুধই খাওয়াব। জন্মানোর পর থেকে সে একটি রাতও ঘুমায় নি, বড় জোর দু-এক ঘণ্টা চোখের পাতা বুঁজেছে। ইদানীং তার ভয়ানক খিঁচুনি শুরু হয়েছে। মরা বাঁচার মধ্যে তার

দিন কাটছে। যন্ত্রণার চোটে সে এমন জোরে দুধ খায় যে, আমার বুক জ্বালা করে, চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়, আর সে-রক্ত ঝরে পড়ে ওর থরথর করে কেঁপে-ওঠা কচি মুখের মধ্যে। এইভাবে আমি যখন একদিন ওকে কোলে করে বসে আছি, তখন আবির্ভাব ঘটল আমাদের বাড়িওয়ালার লোকের। ইনি মহিলা। আমরা শীতকালে তাঁকে ভাড়ার একাংশ দিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে আমরা খোদ বাড়িওয়ালার হাতে টাকা দেব। কেননা ওঁর বিরুদ্ধে বাড়িওয়ালা সমনজারী করেছে। মহিলা এখন চুক্তির কথা অস্বীকার করলেন এবং বাকী ৫ পাউণ্ড দাবি করতে থাকলেন। আমাদের হাতে টাকা ছিল না। ইতিমধ্যে আদালতের বেলিফ এসে হাজির! তারা আমার যা কিছু সম্পত্তি—চাদর, বিছানা, কাপড়চোপড় সব কিছু—এমন কি খোকার দোলনাটি এবং আমার মেয়েদের ভালো ভালো খেলনা পর্যন্ত ক্রোক করল। আমার মেয়েরা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল। বেলিফরা ভয় দেখিয়ে গেল যে, দু-ঘণ্টার মধ্যে টাকা শোধ না করতে পারলে তারা সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। শীতে জমে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাকে বুকের এই খারাপ অবস্থা নিয়ে শুতে হবে ঠাণ্ডা শূন্য মেঝেতে। শ্রাম নামে আমাদের বন্ধু আছে, সে আমাদের জন্য সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটল শহরের দিকে। একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিল সে, ঘোড়া ছুটো কেন জানি হঠাৎ পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎপাত হয়ে পড়ে, সে তখন লাফিয়ে নামতে গিয়েছিল গাড়ি থেকে। তাকে আমাদের বাড়িতে আনা হল রক্তাক্ত অবস্থায়। শীতে কাঁপুনিধরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তখন আমিও কেঁদেছিলাম।

"পরের দিন আমাদের বাড়ি ছাড়তে হল। সেদিন খুব শীত ছিল, তার উপর বৃষ্টি পড়ছিল। চারদিকে কেমন একটা গুমোট ভাব ঘনিয়ে এসেছিল। আমার স্বামী আমাদের জন্য আস্তানা জোগাড়ের চেষ্টা করল। তার মুখে আমাদের চারটি ছেলেমেয়ের কথা শোনার পর কেউই আমাদের মাথা গোঁজার স্থান দিতে রাজি হল না। অবশেষে এক বন্ধু এগিয়ে এলেন।

"এদিকে আমরা আমাদের বাকী ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আর আমাকে তক্ষুনি সব জিনিসপত্র বিক্রি করতে হল যাতে ঔষুধওয়ালা, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, মাংসওয়ালার পাওনা মেটানো যায়। ওরা সবাই আমাদের জিনিসপত্র ক্রোক হতে দেখে পয়সা মারা যাওয়ার ভয়ে একসঙ্গে আমাকে এসে ঘিরে ধরেছে। আমাদের বিক্রি-করা বিছানাপত্র সব একে একে ঘর

থেকে বের করা হল এবং একটা গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। এমন সময় বাড়িওয়ালা দুজন কনস্টেবল নিয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। অনেকক্ষণ সূর্য অস্ত গেছে, কাজেই এখন ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করলে নাকি আইন লঙ্ঘন করা হয়। বাড়িওয়ালার ভয়, আমাদের বিক্রি-করা জিনিসের মধ্যে তারও কোনো মালপত্র থাকতে পারে! তা ছাড়া আমরা নাকি এ-দেশ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যাচ্ছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমাদের দরজার সামনে দু-তিন শ' লোকের ভিড় জমে গেল—যেন গোটা শেলসিয়া পাড়ার সবলোক এসে হাজির! বিছানাপত্র আবার ঘরে ফিরিয়ে আনা হল—পরদিন সূর্যোদয়ের আগে ওগুলো ক্রেতার হাতে দেওয়া চলবে না।

"যখন আমরা আমাদের সবকিছু বিক্রি করলাম, তখন ঋণের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত আমরা শোধ করে দিলাম। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গিয়ে উঠলাম ছোট্ট দুটি কামরায়। এটা লিচেষ্টার স্কোয়ারের এক নম্বর লিচেষ্টার ষ্ট্রীটের একটি জার্মান হোটেল। এখানে আমরা হপ্তায় ৫ পাউণ্ডের বিনিময়ে মানবিক অভ্যর্থনা লাভ করলাম।

"প্রিয় বন্ধু, আপনি আমাদের জীবনের একটি দিনের ঘটনা সম্পর্কে এমন দীর্ঘ পত্র এবং এত বাক-বাহুল্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি এটা সৌজন্যসম্মত নয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এই বুকের ভার আমাদের সবচেয়ে পুরনো সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে সত্যকারের বন্ধুর কাছে অন্তত বারেকের তরে আমাকে নামাতে দিন।"

জেনি মার্কস, আমি এ-কথা লুকাতে চাইনে আপনার চিঠির এই পর্যন্ত পড়ে আমার মনে পুনর্বার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কথা ভেসে উঠল, আর আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল, এমন সময় দেখলাম পত্রের পরবর্তী ছত্রে আপনি জলভরা মেঘের উপর আশ্চর্য ইন্দ্রধনু ফুটিয়ে ওয়েডমেয়ারকে লিখছেন:

"মনে করবেন না এইসব ছোটখাট দুশ্চিন্তা আমাকে নুইয়ে দিয়েছে। আমি খুব ভালোভাবেই জানি আমাদের এই সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর বিশেষ করে আমি তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুখী এবং সৌভাগ্যবতীদেরই একজন! কারণ আমার বন্ধু, আমার স্বামী এবং আমার জীবনের সম্বল এখনো আমার পাশে রয়েছে।"

এই পর্যন্ত লিখে হয়তো কলম তুলে আপনি এক মুহূর্ত কী ভেবেছিলেন।

হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করতে হয়তো একটু দ্বিধা হয়েছিল। তবু আপনি মার্কস সম্পর্কে মনোভাব গোপন করতে পারেন নি :

"আমার মনকে যা সত্যই পীড়া দেয় এবং যা ভাবলে আমার বুক ফেটে রক্ত ঝরে তা হচ্ছে, অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্য তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। অথচ তাকে প্রায় কিচ্ছু সাহায্য করা যাচ্ছে না। যে মানুষ স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে বহুজনকে সাহায্য করেছে সে নিজে আজ এত অক্ষম! কিন্তু প্রিয় বন্ধু ওয়েডমেয়ার, আপনি যেন না ভাবেন আমরা কারো কাছে কিছু দাবি করছি। অবশ্য আমার স্বামী নিশ্চয়ই এটুকু প্রত্যাশা করতে পারেন যে, যাঁদের তিনি উৎসাহ এবং চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন, তাঁরা পত্রিকাটির জন্য আর একটু তৎপর হবেন এবং সাহায্য করবেন। আমি গর্ব এবং জোরের সঙ্গেই এ-কথা বলতে পারি। আমার মনে হয় না এতে কারো উপর কিছু অন্যায় চাপ দেওয়া হয়। অথচ এই জিনিসটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেয়। অবশ্য আমার স্বামী বিষয়টি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে।"

মার্কসের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করা! তার মানে আপনি মার্কসের ব্যক্তিত্বের তলায় অবলুপ্ত হয়ে যান নি। তাই কথাটা অবলীলাক্রমে বন্ধুকে লিখতে পেরেছেন।

এর পরের ছত্রেই স্বামীগর্বে-গর্বিতা মহিমান্বিতা নারী হিসাবে আপনি কতকটা নিজের অজ্ঞাতে মার্কসের যে অন্তরঙ্গ ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা অতি মূল্যবান এইজন্য যে, ঘনিষ্ঠতম সঙ্গিনী হিসাবে স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বড় বিচারক কে আছে :

"কোনো দিন কোনো সময়—এমনকি চরম বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও—সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা হারায় নি বা তার কৌতুকপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। আমাকে খুশি থাকতে দেখলেই এবং আমাদের আদরের খোকাখুকুদের তাদের মা-মণির কোল-ঘেঁসে বসতে দেখলেই সে কৃতার্থ বোধ করে।"

এ হেন যে স্বামী তার কাছেও আপনাকে কিছু কিছু ব্যাপার গোপন করতে হত! কারণ আপনার চিঠিতেই দেখছি :

"প্রিয় ওয়েডমেয়ার, সে জানে না যে আমি আপনাকে আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন সবিস্তারে লিখেছি। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি তাকে এই চিঠির সব কথা বলবেন না। সে শুধু এটুকু জানে যে, আমি

আপনাকে তার নাম করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে পাঠাতে বলেছি।"

আমি দেশ-বিদেশের নারীদের কথা বলতে পারব না, তবে আপনার চিঠির এ জায়গাটা পড়তে পড়তে আমার এই বাংলাদেশের অভাবী সংসারের মা-বোনদের কথাই মনে পড়ে গেল। আপনি যেন তাদের মতোই এক বাঙালী নারী! এঁরা চিরকাল নিজের ছেঁড়া আঁচল দিয়ে স্বামী-পুত্র-কন্যার চোখ থেকে অতি প্রকাশ্য দুঃখের চিত্রও সাধ্যমতো ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। কে যেন কৌতুক করে বলেছিল, এই বাঙালী জাতটা অনেক দিন 'মা' 'মা' বলে ডাকতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়। দেশকে এরা মাতৃমূর্তি হিসাবে কল্পনা করে এসেছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এরা যদি একদিন আপনাকে জননীরূপে আপন করে নেয়, তাহলে সেটাও হয়তো জাতীয় চরিত্রের বিপরীত কিছু হবে না।

মার্কসের ছায়া পড়েছে জগৎজুড়ে, কিন্তু আপনার প্রভাবের প্রয়োজন কি কম? আপনি আমাদের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারেন না? যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁরা কি পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনার আদর্শ সর্বদা পালন করেন? আর তাঁদের জীবনসঙ্গিনীদের কি আপনার কাছ থেকে কিছুই শেখার নেই? আমার আর একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, অথচ গাড়ি-বাড়ি ঐশ্বর্যের আলোয় বাস করে পাশের অন্ধকার কুটিরের দীনদরিদ্র কমরেডটিকে চেয়েও দেখেন না, তাঁদের সম্মুখীন হলে আপনার কি মনে হত? টাকার শক্তির বিরুদ্ধে যোদ্ধা বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা নিজেদের সম্পত্তির একাংশও যদি আন্দোলনের স্বার্থে সঁপে দিতে না পারেন, তাহলে আপনি তাঁদের সম্পর্কে কী মনোভাব অবলম্বন করতেন? আমার মনের মধ্যে আইরিশ নাট্যকার বার্নাড শ'র একটা উক্তি প্রায়ই দোলা দিয়ে যায় : "The most ardent socialist if he owns property can by no means do otherwise than the conservative proprietors until property is forcibly abolished by the whole nation." অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যগ্র সমাজতান্ত্রিকও যদি সম্পত্তির মালিক হয়, তাহলে সে রক্ষণশীল মালিকদের থেকে ভিন্ন প্রকার কিছু করতে পারে না, যতক্ষণ না সমগ্র জাতি কর্তৃক বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আপনিই বলুন বাস্তবতার দিক দিয়ে আইরিশ নাট্যকারের উক্তি কি মিথ্যা? কিন্তু মার্কস কি তাঁর অনুরাগীদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে বলতেন? না একে পরিবর্তনের পরামর্শ দিতেন?

আপনার কাছে এ-সব আমার জিজ্ঞাস্য, কারণ আপনি বেদনার সিন্ধু পার হয়েছেন। অপার দারিদ্র্যের ঢেউ এসে একে একে আপনার চারটি সন্তানকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর সন্তানদের মার্কস এবং আপনি যে কী রকম ভালোবাসতেন তা কে না জানে? আমি এখনো চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি, জগদ্বিখ্যাত মার্কস ছোট মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে চারপেয়ে জীব ঘোড়ায় পরিণত হয়েছেন, শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার যোদ্ধা নিজের মুখে লাগাম পরেছেন, আর গম্ভীর দাড়িওয়ালা মুখে পীঠের যাত্রিনীর চাবুক খেয়ে খুশির ঝলমলানি প্রকাশ করছেন।

আপনি ওয়েডমেয়ারকে ঐ যে চিঠি লিখেছিলেন, তারপর এক বছরও কাটে নি, দারিদ্র্য আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে। এই সময়ে আপনার ছোট্ট ছেলেটি মারা গেল। তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে কম চেষ্টা করেন নি। আপনি অর্থাভাবের বিড়ম্বনা এবং প্রথম মৃত্যুশোকের চিত্র এঁকেছেন মাত্র কয়েকটি কথায় অতি অনাড়ম্বর ভাষায়:

"আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তবু কার্লের কাকার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই ভরসায় আমি অসুস্থ ছেলেকে ফেলে হল্যাণ্ড যাওয়া স্থির করলাম। বৃদ্ধ আমার অনুভূতি বুঝতে পারল না। আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। আমাকে দেখে এডগার একগাল হাসি নিয়ে ছুটে এল। আর ছোট্ট ফক্স তার দুটি ক্ষুদ্র হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বেশিদিন তার স্নেহস্পর্শ আমি ভোগ করতে পারি নি। নভেম্বরে সে নিউমোনিয়ায় মারা গেল। আমার ব্যথার কোনো কূলকিনারা ছিল না। আমি তখনো বুঝতে পারি নি আরো কত দুঃখ আমার জন্য জমা হয়ে আছে।"

এই সময় দারুণ বসন্ত রোগে আপনি আক্রান্ত হলেন। ছেলেমেয়েদের কাছে রাখা নিরাপদ নয়! অনেক চেষ্টার পর এক বন্ধুর বাসায় তাদের স্থানান্তরিত করা গেল। বসন্তের মারী গুটিকার সঙ্গে যুঝতে শূন্য বাসায় আপনার পাশে বসে রইলেন একা মার্কস। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন জয়ী হল, কিন্তু বীভৎস রোগ এসে ট্রায়ারের সেরা সুন্দরীর সব রূপ নিঙড়ে নিয়ে গেল। তবু তাতে আপনার দুঃখ নেই। ভাগ্যকে পরিহাস করে আপনি লিখছেন:

"আমি এখন মার্কসের 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এর কপি নকল করছি। বাইরের জগতের সঙ্গে এখন এই আমার একমাত্র যোগ।"

আর বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্কস কি করছিলেন? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দুটি মূল স্তম্ভ—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব—মার্কস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যখন তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা দুর্দিন চলেছে। আর এই ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ সাল যখন আপনাদের জীবনের সংকট চরমে পৌঁচেছে তখন আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন জার্মান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু ভাইয়ের কাছে আপনি হাত পাতার কথা ভাবতেই পারেন নি।

প্রথম শোকের পর বছর না ঘুরতেই দ্বিতীয় শোকের শূল এসে বিঁধল আপনার বুকে। আপনার শান্ত সংযত লেখার ভঙ্গিটিই মর্মান্তিক অবস্থাকে আরো প্রকট করে তোলে:

"১৮৫২ সালের ইস্টারের সময় আমাদের ছোট খুকী ফ্রান্সিসকা কঠিন ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়। তিনদিন মরা-বাঁচার মধ্যে কাটে। নিদারুণ রোগযন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়। যখন সে মারা গেল তখন আমরা তার প্রাণহীন ক্ষুদ্র দেহটি পিছনের ঘরে রেখে সামনের ঘরে এলাম এবং মেঝেতে বিছানা পাতলাম। আমাদের তিনটি জীবিত সন্তান আমাদের পাশে শুয়ে আছে। আমরা সবাই একসঙ্গে ছোট মেয়েটির জন্য কাঁদতে লাগলাম। আমাদের খুকুমণির এমন সময় মৃত্যু হল যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি অনটন চলছে। আমাদের জার্মান বন্ধুরা তখন আমাদের কিছুই সাহায্য করতে পারেন নি। এই সময় আর্নেস্ট জোনস্ প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য কোনো টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। সমস্ত দুঃখ বুকে চেপে আমি এক ফরাসী বাস্তুহারা বন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি তখন আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে থাকতেন না এবং প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এখন আমাদের নিদারুণ প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালাম। তিনি তক্ষুণি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমার হাতে দুই পাউণ্ড গুঁজে দিলেন। এই টাকা দিয়ে আমার খুকুমণির জন্য কফিন কেনা হল। আমার খুকুমণি এখন সেই কফিনেই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। সে যখন এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল তখন তার শোওয়ার জন্য একটা দোলনা

জোটে নি। আর তার শেষ শয্যা জুটতেও অনেক দেরি হল। কী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে আমরা তাকে কবরে শুইয়ে রেখে এলাম!"

কয়েক মাসের মধ্যে আপনার আর একটি সন্তান অসুখে পড়ল। সঙ্গতিহীন অবস্থায় তার মৃত্যুবর্ণনা আরো গভীর, আরো সংযত :

"এডগারের দেহে দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিল। এক বছর ভুগে তার মৃত্যু হল। আমরা যদি এর আগে অস্বাস্থ্যকর ছোট ফ্ল্যাটটা ছেড়ে যেতে পারতাম এবং খোকাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়ার মতো পয়সা জোগাড় করতে পারতাম, তাহলে হয়তো তাকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু যে গেছে তাকে তো ফেরানো যাবে না…"

শতাব্দীর ব্যবধান পার হয়ে আপনার চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন আমার গায়ে এসে লাগছে—যে গেছে তাকে ফেরানো যাবে না!

বহু সন্তানবিয়োগ-বিধুরা আপনার চতুর্থ সন্তানের মৃত্যুবর্ণনা পড়লে সহসা কারো মনে হতে পারে আপনি প্রায় দার্শনিক নির্লিপ্ততায় পৌঁছেছেন। আসলে ভিতরের বিস্থুভিয়াস আপনি মাত্র দুটি ছত্রের আবরণে এইভাবে ঢেকে রেখেছেন :

"৬ই জুলাই আমাদের সপ্তম সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু সামান্য একটু নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত সে মাত্র বেঁচে ছিল। তারপর সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল।"

এ ছাড়া আপনি আর কি-ই বা লিখতে পারতেন! অথচ মাত্র কটি কথায় যেন আপনাদের জীবনের সমস্ত বঞ্চনা ভাষা পেয়েছে: "সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল!" এইভাবেই চিরদিন গভীর বেদনার চাপে মুখর ভাষা মৌন হয়ে আসে!

এর তিন বছর পরে ওয়েডমেয়ারের স্ত্রীর কাছে তাঁর দুঃখের দিনে আপনি সুদীর্ঘ এক পত্র লিখেছিলেন। তাঁর শেষ ক-টি ছত্রে আপনি প্রিয় বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

"এই দারুণ দুঃসময়ে বীর হও! সাহসী হও! দুনিয়া তাদেরই যারা নির্ভীক! তোমার স্বামীর বিশ্বস্ত এবং দৃঢ় সঙ্গিনী হও! দেহ এবং মনের দিক দিয়ে সক্রিয় থাক! তোমার স্নেহের খোকাখুকুদের কাছে নকল-শ্রদ্ধার মুখোসখোলা সত্যিকারের কমরেড হও!"

চিরকাল শুনে এসেছি: আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবে। আপনি আপনার বান্ধবীর জন্য ঠিক তাই করেছেন। এ উপর থেকে উপদেশবর্ষণ ন ভিতর থেকে উৎসারিত মানবাত্মার মহাসঙ্গীত। তাই এ ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বিজ্ঞানাচার্যের হৃদয়বত্তা

১৯০৯ সালের মাঝামাঝি আমি তখন হিন্দু স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। দর্জিপাড়ার বাড়ি হইতে নিত্য দু বেলা পায়ে হাঁটিয়া াতায়াত করিতে হইত। এক দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি, মা তাঁর মবয়সী এক মহিলার সহিত গল্প করিতেছেন। আমাকে বলিলেন, 'প্রণাম র, তোর মাসিমা।' নূতন মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে দেখার ন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। কত ছোটটি দেখেছি, এখন কত বড়োটি য়ে গেছ। তা তোমার লেখাপড়ায় অসুবিধার কথা শুনেছি। তুমি কাল কালেই যেয়ো আমাদের বাড়ি। বোদে-কে বলে দেব, সে তোমার দেখাশোনা রবে।' বোদে সত্যেন্দ্রনাথের পারিবারিক ডাক নাম—বোধ হয় বৈদ্যনাথের ংক্ষিপ্ত রূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেই বৎসরেই হিন্দু স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে দশজন ছাত্র সে বৎসরে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মাসিক কুড়ি টাকা লপানি পান, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে পঞ্চম। কিন্তু ছাত্রমহলে তাঁহার াতি তখনই ছিল তাহার অনেক ওপরে। সম্প্রতি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র হলানবিশ তাঁহার সত্তর জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথায় লিয়াছেন যে, 'সত্যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হয়ে ভর্তি য়েছে জেনে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, তার সঙ্গে আলাপ হবার সম্ভাবনায়।' এ হেন সত্যেন বোসের কাছে পড়িতে পাইব, এ ছিল আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের আদিনিবাস কাঁচড়াপাড়ার অনতিদূরে বড় াগুলিয়া গ্রামে। কিন্তু সে গ্রামের সহিত তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি াবরে কলিকাতাতেই মানুষ। যে বাড়িতে তিনি এখন থাকেন তা-ও তাঁর র্বপুরুষদের নিকট হইতে পাওয়া। অবশ্য ইহার বর্তমান রূপ দিয়াছেন তাঁহার পিতা সুরেন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে ইহার চেহারা ছিল একেবারে আলাদা।

নানা পারিবারিক কারণে স্থরেন্দ্রনাথকে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে। বাড়িটি তখন ভাড়া দেওয়া হইত। স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যাকে অনেক সময় বিদেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না, তাহাদের রাখিয়া যাইতেন অন্য একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়া। এই পর্বে দর্জিপাড়ায় এক সরু গলিতে একটি বাড়িতে পাশাপাশি দুই অংশে বাস করার ফলে আমার মায়ের সহিত সখীত্ব হয় মাসিমার। আমি তখন এত ছোট ছিলাম যে সে সময়ের কোনো স্মৃতি আমার ছিল না। আমার দিদি সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক মাসের বড়। তার রং ছিল খুব ফরসা, ও চোখ কটা। তাই তার একটি আদরের নাম ছিল মেরী। দুটি পরিবার কয়েক মাস একত্রে থাকার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ভাড়াটিয়া জীবনের নিয়মানুসারে। ইতিমধ্যে স্থরেন্দ্রনাথ চলিয়া যান আসামের স্থদূর পার্বত্য অঞ্চলে রেল লাইন পাতার কাজে হিসাবরক্ষক হইয়া। আমার এক নিকট আত্মীয় পরিবারও সেখানে যান চাকুরীর তাগিদে। সাপটগ্রামে এই পরিবারের সহিত মাসিমার যোগাযোগ হয়। আলাপ-প্রসঙ্গে 'মেরী' এই অপ্রচলিত নামের বালিকার উল্লেখে মাসিমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। তাঁদের নিকট হইতে আমাদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার তাঁর পুরানো সখীকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁদের পুনর্মিলন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পরদিন সকালে গেলাম সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। কাছাকাছি পড়িয়া থাকায় আমাদের মুখ-চেনা ছিল, তাই সংকোচ কাটিয়া গেল সহজেই। ঠিক হইল তখন হইতে আমি প্রত্যহ দু-বেলা সত্যেন্দ্রনাথের পড়িবার ঘরেই বসিয়া পড়াশোনা করিব। অল্পদিনেই একেবারে বাড়ির লোক হইয়া গেলাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাসিমা পরিচয় দিতেন, 'এটি আমার বোন-পো, বোদের ছোট ভাই।' মেসোমশায়কে তখনও বছরের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইত নানাস্থানে, যেখানে নূতন রেল লাইন পাতা হইত। মাসিমার শরীর মোটেই স্থস্থ ছিল না। আর আমার মা তো ছিলেন চির-অস্থস্থ। দিদির বিবাহ হইয়া গেল পূর্ববঙ্গে, তাহাকে সেখানেই থাকিতে হইত অনেক সময়। বাবার চাকরীতে ছুটির ব্যবস্থা ছিল খুবই কম। অনেক রবিবারেও তিনি বাড়িতে থাকিতে পাইতেন না। স্থতরাং দাদাই আমার জীবনের হইলেন প্রকৃত অভিভাবক।

আমি যখন স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, সত্যেন্দ্রনাথের তখন কলেজে ফার্স্ট

ইয়ার। কিন্তু তখনই তিনি আমায় দিলেন তাঁর পড়িবার ঘরের অবাধ স্বাধীনতা। এ পর্যন্ত বাংলা নভেল পড়িতাম লুকাইয়া চুরি করিয়া। এখন তাঁর ঘরের নিরাপত্তায় বসিয়া প্রথমেই দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গিলিয়া ফেলিলাম। স্কুলের পড়ার যখন যতটুকু দরকার তাতে আর কতটুকু সময় লাগিত। বাকী সময়ে কাজ ছিল দাদার সঙ্গে গল্প করা, তাঁর অবসর মতো। এই গল্প-আলোচনার ভিতর দিয়াই হইত আমার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ধারণায়, দাদা সেই-প্রকৃতির লোক যাকে বলা যায় 'জাত-মাস্টার'। কোনো কিছু পড়িয়া ভালো লাগিলে তা তখনই আমায় বোঝাইতেন। যে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। কেবল আমি নই, সেই সময়ে কত যে ছাত্র তাঁর কাছে আসিত পড়া বুঝিয়া নিতে তা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁর নিজের পড়া যে কখন করিতেন, বোঝাই যাইত না। আসল কথা, তাঁর নিজের পড়া তিনি অনেক আগেই শেষ করিয়া রাখিতেন, কলেজের ক্লাসগুলিতে হইত তাঁর রিভিশন্-এর কাজ।

দাদা ছেলেবেলায় ছিলেন বাড়ির কাছের নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হিসাবে সেখানে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কেহ ছিল না। তাই এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঠার পর মেসোমশায় তাকে ভর্তি করিয়া দিলেন হিন্দু স্কুলে, যাতে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ঠিকমতো পরীক্ষা হয়। সেটা ছিল ১৯০৭ সাল, যাতে সে ১৯০৮ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। পরীক্ষায় ঠিক দু দিন আগে দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথের বসন্ত হইয়াছে। পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল। তাকে আর এক বছর পড়িতে হইল হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসাবে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মন আগামী বৎসরের পরীক্ষার অপেক্ষায় কেবল পুরানো পড়ায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। কলেজে গিয়া গণিতের যে সব বিষয় পড়িতে হইবে তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন নিজের চেষ্টায়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের মধ্য-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়িয়া ফেলিলেন। আর পড়িলেন ঐতিহাসিক গ্রীন-এর স্থবিখ্যাত গ্রন্থ—'এ শর্ট হিস্ট্রী অব্ দি ইংলিশ পীপল।' এ পর্বে আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু ইহার ফলের সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের 'মেঘদূত' হইতে আবৃত্তি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। আর দেখিয়াছি, ''হিস্টোরিয়ান্স হিস্ট্রী অব দি ওয়ার্ল্ড' সীরিজের

ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিপুল গ্রন্থ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্র, ইহার কোনো বিভাগকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। শারীরিক কুশলতায়ও তিনি সব্যসাচী, কেননা, লেখার বা খাওয়ার ব্যাপারে তিনি দক্ষিণহস্তের ব্যবহারে সুদক্ষ হইলেও একটা পেনসিল কাটিতে গেলে তাঁর বাম হস্ত আগাইয়া আসে। ক্যারম, ব্যাডমিনটন ও টেনিস খেলাতেও তিনি বামপন্থী। হিন্দু স্কুলে তখন গণিতের শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রলাল বক্সী। তাঁহার মতো বিজ্ঞান-পাগল গণিত-শিক্ষক খুব কম দেখা যায়। পরে আমরা যখন তাঁহার ছাত্র হই তিনি আমাদের ক্লাসে প্রায়ই বলিতেন, 'তোমরা কলেজে গিয়ে সবাই বিজ্ঞান পড়ো। বর্তমান জগতে বিজ্ঞান না জেনে বাস করা মিথ্যা। কলেজে না গেলে, ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট না করলে, বিজ্ঞান শেখা অসম্ভব। আর্টস্-এর যে কোনো বিষয় তো তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরাই পড়ে নিতে পার।' তিনি আরো বলিতেন, 'সত্যেন আমার আদর্শ ছাত্র। না, এ-ও ঠিক বলা হল না। আমি অনেক সময় ভাবি যে আমিই তার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি।' ১৯০৯ সালে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় কিন্তু এই আদর্শ ছাত্র তাঁকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল গণিতে 'ফুল মার্কস' না পাইয়া। ব্যাপারটি হইয়াছিল এইরূপ। পরীক্ষার খাতা জমা দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আসিলেন হিন্দু স্কুলে, বক্সী মহাশয় তার অপেক্ষায় আছেন। প্রশ্নপত্র হাতে রাখিয়া দুজনে মুখে মুখে অঙ্কগুলি কষিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, একটি অঙ্কে সত্যেন্দ্রনাথ ১১৭কে আর ভাঙেন নাই, অবিভাজ্য ভাবিয়া। বক্সী মহাশয় বলিলেন—ন তেরম্? দু-জনেরই মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। অঙ্কে ফুল মার্কস না পাইলেও, সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাস-ভূগোলে এত বেশি পাইয়াছিলেন যে, খুব সম্ভব তাহাতে তিনিই হইয়াছিলেন প্রথম। ইহা দেখিয়া কলেজে ভর্তি হইবার সময় মেসোমশায় দাদাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন আর্টস্ কোর্সে ভর্তি হইতে।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের দিক হইতে যাহাই হোক, পরীক্ষায় সাফল্যের দিক হইতে মেসোমশায়ের পরামর্শ যে অসমীচীন ছিল না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল পরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বিখ্যাত ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেও পড়াইতেন; অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ বা অধ্যাপক পার্সিভাল বি-এ ক্লাসের নিচে

পড়াইতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন জানা গেল যে আর কয়েক মাস পরেই অধ্যাপক পার্সিভাল অধ্যাপনা হইতে অবসর নিয়া তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে গিয়া বসবাস করিবেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপক ঘোষের নিকট এই ইচ্ছা জানান যে তাঁরা অন্তত কিছুদিনের জন্যও পড়িতে চাহেন অধ্যাপক পার্সিভাল-এর কাছে। ছাত্রদের এই ইচ্ছা পার্সিভাল সাহেবকে জানানো হইলে এই ব্যবস্থা হয় যে, মিলটন-এর 'কোমাস্'-এর অবশিষ্ট অংশ পার্সিভাল সাহেবই পড়াইবেন অধ্যাপক ঘোষের বদলে। ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তবুও, আমার মনে আছে, পার্সিভাল সাহেবের ক্লাসে পড়ার পর দাদার কি অপরূপ উৎসাহ ও ভক্তি। সেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজি রচনা অংশটি পার্সিভাল সাহেবই পরীক্ষা করিলেন স্বেচ্ছায়। সেই পরীক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমি পরে শুনিয়াছি আমারও অধ্যাপক স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখে। তিনি ছিলেন পার্সিভাল সাহেব-এর একান্ত অনুরক্ত শিষ্য। তিনি আমাকে বলেন, 'পরীক্ষায় দেখা গেল দুটি ছাত্র ১০০ ভিতর ৬০ পাইয়াছে। একজন আর্টস বিভাগের, আর সায়েন্স বিভাগ থেকে সত্যেন। কিন্তু সত্যেনের খাতার উপরে সাহেব লিখিয়া দিয়াছেন ৬০+১০, এই মন্তব্য করিয়া যে এই ছাত্রটি অসাধারণ, ইহার নিজস্ব কিছু বলিবার আছে।' তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে দেখিতে চাহেন ও দেখিয়া সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা আমার না বলিয়া উপায় নাই। দাদার কাছাকাছি থাকিয়াও আমি স্কুলে, কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে কোনো পরীক্ষাতেই আশানুরূপ ফল দেখাইতে পারি নাই। দাদার বক্তব্য ছিল, "পরীক্ষার হলে তোর কি হয় বুঝতে পারি না।" এ সত্বেও আমি কোনোদিন তাঁর স্নেহে ও আগ্রহে বঞ্চিত হই নাই। তার এই সহৃদয়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া আমি মনে করি।

তাঁর অনুচর হইয়াই আমি বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি পার হইয়া প্রথমে ইংরেজি ও পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের সীমাহীন প্রান্তরে পদার্পণ করি। দাদার ঘরে কখনও নূতন বই-এর অভাব হইত না। বিজ্ঞানের বইগুলির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। কারণ, বাবার আদেশে

আমাকে আর্টস পড়িতে হইল, যদিও তার মধ্যে একটি বিষয় রহিল গণিত। কলেজে আমি যখন প্রথম বার্ষিকে, দাদার তখন পঞ্চম বার্ষিক। ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এস-সিতে দাদাই হইলেন প্রথম। কিন্তু তাঁর বি-এস-সি পরীক্ষার একটি দিনের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারির্ব না।

এই সময়ে হেদুয়া পুকুরের একটি কোণে এখন যেখানে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের প্যাভিলিয়ন, শীতের শেষে ও পরীক্ষা পর্বের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন কলেজের কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছাত্রদের একটা মণ্ডলী জমায়েত হইত প্রতি সন্ধ্যায়। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে ছিলেন সত্যেন বোস। ম্যাট্রিক দেবার পর আমিও তাতে যোগ দিতাম। তার আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমাকে বিকালের খেলাধূলার পর বাড়িতে ফিরিতে হইত গ্যাসের বাতি জ্বালার আগে মায়ের কড়া হুকুমে। ম্যাট্রিক দিবার পর হেদুয়ার আড্ডা হইতে সন্ধ্যা হইতেই উঠিয়া পড়িতেছি দেখিয়া দাদার প্রশ্ন—"কোথায় যাচ্ছিস ?" উত্তর দিলাম—"বাড়ি।" দাদার নির্দেশ আসিল—"বোস। দেরি হলে একদিন বকুনি খাবি দ্বিতীয় দিনও খাবি তারপর থেকে আর কেউ বকবে না।" জীবনে এই আমার প্রথম মুক্তির আস্বাদ বাড়ির শাসন হইতে। কিন্তু দাদার মুক্তির আদেশে শাসনের বাঁধনও কম ছিল না। সপ্তাহে তিনদিন শ্রমজীবীদের নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইতে হইত, সন্ধ্যায় আড্ডার মোহে আটক থাকিবার জো ছিল না। সে যাই হোক বি-এস-সি পরীক্ষার গণিতে অনার্সের পালা চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। তিনি তখন প্রায়ই খালি গায়ে একটা চাদর চড়াইয়া আসিতেন। প্রথম দিনের পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের দেখা নাই। আমি ভাবিতেছি, একবার তাঁর বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসিব কিনা। এমন সময় দেখা গেল দাদাকে। তাঁর এমন বিশীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তিনি-ই বলিলেন—"আমি সব কটা অঙ্ক কষতে পারি নি। এই প্রথম পরীক্ষার হল থেকে অঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি।" কী শুষ্ক, করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরে জানা গেল, কেমব্রিজের সিনিয়র র‍্যাংলার পরাঞ্জপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তিন ঘণ্টার মধ্যে ৭৮ নম্বরের বেশি উত্তর করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের এম-এস-সি পরীক্ষার ফলপ্রকাশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমনরুমে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি দাদা সেখানে। তিনি তো তখন আর কলেজের ছাত্র নন, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি এখানে কি কাজে ?' জানিতে পারা গেল একটু পরে যে তিনি আসিয়াছিলেন ইউনিভারসিটি অফিসে মার্কশীট্ নিতে। খুলিয়া পড়িয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! আটটি পেপারের দুটিতে ফুল মার্কস, আর দু-একটিতে ৯৬-এর কাছাকাছি, সবচেয়ে নিচু নম্বর হচ্ছে ৮৮। এই মার্কশীট্ এখন কোথায় আছে জানি না, ইহাকে আমি আর কখনও দেখি নাই, বা এই প্রসঙ্গে কোনো কথা কারো কাছে শুনি নাই। ইহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইলে, জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে করা উচিত নয় কি ?

এই দলিলটিকে উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ-এর জীবন-সংক্রান্ত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বোধ হয় চিরকালের মতো নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এটি আমি একদিন দেখিয়াছিলাম মেসোমশায়ের কাছে। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছি যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন সেটি তিনি কোথায় রাখিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের যখন নামকরণও হয় নাই, তখন একজন অখ্যাত গণৎকার এই 'নবজাতকের' সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছিলেন যে, তাহার হইবে অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রচুর খ্যাতি, কিন্তু তাহার চক্ষু হইবে চিরকাল রোগগ্রস্ত। এটুকু লেখা ছিল একটুকরা কাগজে। দাদাও বোধ হয় এটিকে কখনও দেখেন নাই, বা দেখিলেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টির এই দুর্বলতা না থাকিলে দাদা হয়তো একজন নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়ও হইতে পারিতেন, এ কথা ভাবিয়া আমার খুব মজা লাগে। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে দাদার সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্ল রায়, যিনি পরে সিনেমা জগতে বিখ্যাত হন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন কলেজ ফুটবল টিমের একটি প্রধান স্তম্ভ। শুধু তাই নয়, এরিয়ানস্ ক্লাবের ফরওয়ার্ড-খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম ছিল বাংলাদেশে সুবিদিত। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যবর্তী মাঠটিতে তখন বিকালে ফুটবল খেলা হইত। হঠাৎ দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র দুপুরবেলায় কাজের রুটিনে ফাঁক থাকিলে ফুটবল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সত্যেন বোস ও প্রফুল্ল রায় দুজনেই ছিলেন এই দলে। প্রফুল্ল রায় দাদার কাছে আসিতেন পড়াশোনা করিতে ও গল্প করিতেনও প্রচুর। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'সত্যেন, তুই অবাক করলি ; তুই গোলকীপার থাকলে

গোল দেওয়া খুব কঠিন, এ আমি দেখেছি। আশ্চর্য তোর পজিশনের জ্ঞান।' পরে উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, 'তবে আমাদের একটা সুবিধা আছে। কোনোক্রমে ধাক্কা দিয়ে তোর চোখের চশমাটা ফেলে দিতে পারলে হয়। তখন তো তুই একদম অন্ধ।' এই ফুটবল খেলায় দাদা বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এ তুপুরে-মাতন বেশি দিন টিকিল না। প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ কড়া নোটিশ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, স্কুলের ও কলেজের পড়ানোর কাজে ব্যাঘাত হয় বলিয়া।

এই হেয়ার-গ্রাউণ্ডেই সত্যেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ্য রূপ আমরা দেখিয়াছি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন এক ছাত্রকে, যিনি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, ফিজিক্সের অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব অকস্মাৎ অপমান করিয়া বসেন। খবরটি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা কলেজের ছাত্র-ধর্মঘট ঘটিয়া গেল। আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রায় নবাগত ছাত্র। দেখিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতেছেন এই জাতীয় অপমান সহ্য না করিতে। সারা দিনের শেষে হ্যারিসন সাহেব নতি স্বীকার করায় ব্যাপার সেই একদিনেই চুকিয়া গেল। কিন্তু জেমস্ সাহেব সতর্ক হইয়া কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রচলন করিলেন যাহাতে পরে "ওটেন-কাণ্ডের" পথ প্রশস্ত হইল। ওটেন-কাণ্ড যখন ঘটিল ১৯১৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর্বেই এম-এস-সি পড়িতে পড়িতে দাদার বিবাহ হয়। মেসোমশায়কে বেশির ভাগ সময় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে, মাসিমার শরীর প্রায়ই থাকিত অসুস্থ। তাই মায়ের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ফেলিতে পারিলেন না। কন্যা নির্বাচনে পাত্রের মতামতের প্রশ্ন—পাত্রীর কথা দূরে থাক—তখনও সমাজে প্রকট হইয়া ওঠে নাই। সত্যেন্দ্রনাথও তোলেন নাই—যদিও তিনি ইবসেন, রোলাঁ, গোর্কি সাহিত্যে মশগুল ছিলেন। তখনকার যুবক সমাজের সামনে বরপণ-প্রথাই ছিল সবচেয়ে বিকট পারিবারিক প্রশ্ন। দাদা কন্যা নির্বাচনে মাসিমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া একটি শর্ত না করিয়া পারিলেন না যে যৌতুক হিসাবে একটি পয়সাও দাবি করা চলিবে না। আমি জানি, তখন এক কন্যাপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা (তখনকার দিনের) লইয়া সাধাসাধি করিতেছিল। কিন্তু মাসিমা নিরুপায়, যেহেতু এ বিষয়ে দাদা অটল। দাদার মতো মাতৃভক্ত ছেলের কাছেও মাসিমাকে হার

স্বীকার করিতে হইল, কারণ সামাজিক ন্যায়-বিচার ছিল দাদার দিকেই। দাদার শ্বশুরমহাশয় এ হেন সুপাত্রকে বিনা যৌতুকে পাইয়া খুশি হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তবে যখন তিনি শুনিলেন যে বিবাহের রাত্রে বরানুগমনে আসিবে আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও পাত্রের বন্ধুগোষ্ঠী কমপক্ষে তুইশত জন, তখন, ডাক্তার মানুষ তিনি, তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল এই প্রতিভাবান যুবকটি প্রকৃতপক্ষে সুস্থমস্তিষ্ক কিনা। কে না জানে প্রতিভার সহিত উন্মাদরোগের সম্পর্ক খুব দূরের নয়। অথচ আমরা যারা সত্যেন্দ্রনাথের নিকটস্থ লোক আমাদের পক্ষে, তার বন্ধুসংখ্যা এর চেয়ে কম করিয়া ধরাই ছিল অস্বাভাবিক—যুবক মহলে এমনই ছিল তার জনপ্রিয়তা। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। মেসোমশায় আসিয়াছেন ছেলের বিবাহ দিতে, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময় পুরানো ঘটক আসিল খোঁজ লইতে দাদার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে কিনা। এ সেই ঘটক যে কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত কন্যাপক্ষের লোক। সে আসিয়া দেখিল তত্ত্ব পাঠানোর আয়োজন হইতেছে। তাহাতে সে 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। মেসোমশায়-এর এক রসিক আত্মীয় বলিয়া উঠিলেন—'তুঃখ করছেন কেন ঘটকমশায়, আরো পাঁচ হাজার টাকা চড়িয়ে দিন না, তাহলে আমরা এখনই তত্ত্বের ঠিকানা বদল করে দিই।' ঘটক মহাশয় সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—'সত্যি বলছেন, তাহলে আমায় আধ ঘণ্টাটাক সময় দিন, আমি একটিবার জিজ্ঞাসা করে আসি।' আত্মীয়ের এই বদ-রসিকতায় মেসোমশায় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘটককে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে তাঁর ছেলে-বেচার ব্যবসায় নেই, ও ভদ্রলোকের কথার নড়চড় হয় না। তত্ত্ব যথাস্থানে পৌছিল, ও যথানির্দিষ্ট দিনে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল।

ছাত্রজীবন শেষ হইলেই প্রশ্ন ওঠে জীবিকার। পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাফল্যের পর সরকারি চাকুরির কোনোরকম সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু শৈশকালের স্বদেশী আন্দোলনের জলন্ত অনুপ্রেরণা দাদাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ সেবাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন শুরু হইয়াছিল আশুতোষের নেতৃত্বে। কেবলমাত্র পরীক্ষা-পরিচালক প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনিভারসিটির রূপান্তর হইতেছিল উচ্চতম জ্ঞানানুশীলনের ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্রে। প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিবান তরুণ

যুবকদের এই বিরাট প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত করা আশুতোষের দূরদৃষ্টির অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এম-এস-সি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষণের কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁর জীবনের একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। এজন্য আশুতোষের নিকট সত্যেন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু আদর্শ-নিষ্ঠ জীবনের পথ কোনো দিনই মসৃণ হইতে পারে না। কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন জীবনে আশুতোষের পরিচালনার কোনো কোনো ত্রুটি সত্যেন্দ্রনাথের চোখে পড়িলে তিনি সমালোচনা চাপিয়া যাইতে পারিতেন না। আর অপরের দৃষ্টি হইতে সত্যেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল এই যে, তাঁর সমবয়সী অন্যেরা যখন গবেষণার ফলে নানা বিষয়ে 'ডক্টরেট' উপাধি অর্জন করিতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ থাকিয়া যাইতেছেন শুধুমাত্র এম-এস-সি। অনেকের ধারণা হইত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী নন, তাঁর শক্তি আছে কিন্তু তিনি আড্ডাবাজ। তাঁকে দেখা যাইত হয়তো কোনো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়া কলিকাতার পথে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া যাইতেছেন গল্প করিতে করিতে। তিনি তাস ও দাবা খেলেন। ধূমপানে অভ্যস্ত, এসরাজ বাজান। আর সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের নানা গ্রন্থ ফরাসী, ইতালীয়ান ও জার্মান ভাষায় পড়িয়া বিজ্ঞানের অবহেলা করেন। সত্য কথা বলিতে কি এ অভিযোগ আমার মনেও কোনো দিন ওঠে নাই বলিতে পারি না। কিন্তু দাদার খুঁত-ধরা ছিল আমার স্বভাব ও শিক্ষার বিরুদ্ধে। তবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার মনের ভাব তিনি ধরিয়া ফেলেন। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, তিনি সেদিন আমায় বলিয়াছিলেন—'দেখ, জ্ঞানের রাজ্যে এখন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন চলছে। কোনো বিষয়ের জ্ঞানকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। গণিত, চট্ করে করা পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণ—এদের শিকড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই, ভালো কিছু করতে গেলে অনেক জানতে হয়, গভীরভাবে ভাবতে হয়। তার জন্যে সময় লাগে।" কথাগুলি তিনি আমায় বলিয়াছিলেন একেবারে সাধারণ সুরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসির সহযোগে। কিন্তু আমার মন তখনই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে অল্প কয়েক বছর কাজের পর সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন ঢাকায়—পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার-এর পদে যোগ দিতে।

প্রোফেসার পদে রহিলেন মিঃ জেন্‌কিন্‌স্, যিনি পরে বাংলাদেশের ডি-পি-আই হইয়া যান। এখানে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, তিনটি বিষয় লইয়াই যথাসাধ্য মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনীষার ফল প্রকাশ্যে দেখা দিতে বিলম্ব হইল না। টাইপ-করা পাঁচ-ছয় পাতার একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠাইয়া ছিলেন ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিখ্যাত মুখপত্র ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে, যাহাকে সংক্ষেপে বলা হয় ফিল-ম্যাগ। ঢাকা নামক অখ্যাত ইউনিভারসিটির এক অখ্যাত শিক্ষকের এই প্রবন্ধ ফিল-ম্যাগের কৌলীন্য-দৃপ্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আপন প্রবন্ধের কপি সরাসরি পাঠাইয়া দেন আইনস্টাইনকে। জগৎ-বরেণ্য বিজ্ঞানী তৎক্ষণাৎ ইহাকে জার্মান ভাষায় স্বয়ং অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন 'টসাইটশ্রিফ্‌ট্ ফ্যর ফিজিক্'-এ, এই মন্তব্যসহ যে প্রবন্ধটিকে তিনি মনে করেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি জটিল সমস্যার এক দ্যোতনাময় সমাধান। ইংরেজিতে প্রকাশিত না হওয়ায় এ দেশের বিজ্ঞানীমহলে তাহা প্রায় অখ্যাতই রহিয়া গেল।

ঢাকা ইউনিভারসিটির সংবিধানে ছিল যে উন্নততর জ্ঞানানুশীলনের জন্য কোনো প্রোফেসর বা রীডারকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠানো যাইবে দু বছরের জন্য। কাহাকে পাঠানো হইবে এই প্রশ্নের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথই নির্বাচিত হন। ভাইস চান্সেলর মিঃ হার্টগ এই সিদ্ধান্ত সত্যেন্দ্রনাথকে জানাইবার সময় আভাস দেন যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে এমন কোনো শর্ত নাই, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের উচিত কোনো ইওরোপীয় ইউনিভারসিটির ডক্টর হইয়া ফেরা, কারণ তিনি এ পর্যন্ত গবেষণা জাতীয় কোনো কৃতিত্ব দেখান নাই। সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁহাকে দেখান আইনস্টাইনের মন্তব্য। মিঃ হার্টগ জার্মান জানিতেন, তাই আমতা আমতা করিয়া বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।" সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতির সূত্রপাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ঢাকার সহিতই জড়িত রহিয়াছে তাঁর জীবনের এক শোচনীয় দুর্ঘটনার স্মৃতি। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র সবে হাঁটিতে শিখিতেছে এমন সময় ফুটন্ত গরম দুধের কড়ার ভিতর পড়িয়া যায় ও নাভিকুণ্ড পুড়িয়া যাওয়ায় অচিরে প্রাণত্যাগ করে। মাসিমা তাহাতে বৌদিদি সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কারণ তাঁহার ধারণা হয় বৌদিদির অনবধানতাই এই শোকাবহ ঘটনার মুল কারণ। বৌদিদি মানুষ হিসাবে খুবই ভালো, কিন্তু সাংসারিক গৃহিণীপনায় তার

কুশলতার অভাব ছিল। আর মাসিমা ছিলেন অতিমাত্রায় সুগৃহিণী। আপন হৃদয়ের বিশালতা দিয়া দাদা দুই বিরুদ্ধপক্ষের শোকের গভীরতা আত্মস্থ করিতে পারায় সংসারে শোকের মধ্যেও শান্তি অব্যাহত থাকে।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচারিত হইয়া গেল। ইহার সিদ্ধান্তগুলির সহিত আইনস্টাইন এবারে একমত হইতে না পারায় বিজ্ঞানজগতে দেখা দিল তীব্র বিতর্ক। ঢাকা হইতে তোড়জোড় করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে পৌঁছাইয়া দেখিলেন তাঁহার খ্যাতি আগেই প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। মাদাম কুরি-র লেবরেটরিতে তিনি সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়া গেলেন বিনা চেষ্টায়। ফরাসী ভাষা তিনি পড়িতে পারিতেন প্রায় ইংরেজির মতো স্বচ্ছন্দে, কিন্তু এ দেশে কথা বলার সুযোগ ছিল না। সেখানে তাঁহার মুখ ফুটিল এক নূতন ভাষায়। দু বছরের ছুটির এক বছর কাটিল প্যারিসের বিজ্ঞানী মহলে। তাঁহার হৃদয়বত্তার গুণে তিনি অনেকের পারিবারিক বন্ধু হইয়া উঠিলেন, যাঁহারা এখনও তাঁহাকে ভোলেন নাই। প্যারিস হইতে গেলেন বার্লিনে। ইংলণ্ডে যাইবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। বার্লিনের হোটেল হইতে টেলিফোনে আইনস্টাইনকে জানাইলেন যে, তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও বিশ্ববিজ্ঞানের সর্বাগ্রগণ্য পুরোহিতের তিনি দর্শনার্থী। আইনস্টাইন টেলিফোনেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল বিতর্ক-বিচার। আবার ভাষা বিভ্রাটের পালা। জার্মান বলার অভ্যাস তো সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। এখানেও আইনস্টাইন তাঁহাকে সাময়িকভাবে তাঁহাদের সর্বোচ্চ আলোচনা সভার—কলোকিয়াম্-এর—সম্মানিত সভ্য করিয়া লইলেন। এখানেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তিনি হইয়া উঠিলেন পারিবারিক বন্ধু।

বার্লিনে থাকিতেই সত্যেন্দ্রনাথ খবর পাইলেন যে মিঃ জেনকিনস্ ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন কলিকাতায়। তাঁহার শূন্যপদের জন্য প্রার্থী ডাকা হইবে কেবল ভারতে নয়, বাহিরেও। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক শুভার্থী লিখিয়া পাঠাইলেন, সত্যেন্দ্রনাথ যেন আবেদনপত্র পাঠান ও সেই সঙ্গে অতি অবশ্য একখানি সার্টিফিকেট—আইনস্টাইনের। আবেদন পাঠাইবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বাধ্য হইলেন আইনস্টাইনকে ব্যাপারটা বোঝাইয়া বলিতে। আইনস্টাইন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি বিজ্ঞানের যে কাজ করেছ

তাই কি যথেষ্ট সার্টিফিকেট নয়? পরে শুনিয়াছি, দাদার মুখে নয়, আইনস্টাইন নাকি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার এ দেশে আসায় আমরা উপকৃত হইয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ এ দেশে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ যান জার্মানিতে ও আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভারতীয় গণিতবিদ্ বোসের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এ বোস যে কে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। আইনস্টাইন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই বোস এমন একজন গণিতবিদ যাঁহার প্রতিভায় যে-কোনো দেশ গর্বিত হইতে পারে। দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ এই বোসকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও আমন্ত্রণ করেন শান্তিনিকেতনে। এই আলাপ পরিচয়ের ফলেই 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভূমিকা।

দাদা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গদ্য রচনার আজন্ম ভক্ত। 'কথা ও কাহিনী' ও 'চয়নিকা'-র বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। মনে আছে তাঁর কাছে আমি 'গোরা' পড়িয়াছিলাম এক অভিনব প্রথায়। যেখানে যেখানে আছে গোরা ও বিনয়ের তর্ক, সেখানে একপক্ষের যুক্তি পড়ার পর বই মুড়িয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে অন্যপক্ষের খণ্ডন কি হইতে পারে। তা ছাড়া, 'সবুজপত্র' প্রকাশের সময় প্রমথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে যে আসর বসিত দাদার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল নিয়মিত। মাঝে মাঝে আমিও সেখানে গিয়াছি আমার ছাত্রাবস্থায় দাদার অনুচর হইয়া। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'-র আসরেও গিয়াছি তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু তাঁহাকে কখনও আগাইয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে দেখি নাই। দেশে থাকিতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহাকে না চেনার ইহাই ছিল প্রধান কারণ।

অথচ একদিক দিয়া দেখিলে দাদাকে বলা যায় কবিগুরুর ভক্ত—একলব্যের মতো। দাদা তো কেবল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নন, তিনি মনে-প্রাণে দেশসেবী, বাংলাভাষী সমগ্র জনসাধারণের আপনজন। এই বাঙালী জাতির সুখদুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের চেয়ে গভীরতর। বাঙালী জাতিকে যে ভালোবাসে সে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি না করিয়া পারে না। তাই দাদার মনন ও চিন্তা কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল অঙ্কের মধ্যে আটকাইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে বিশাল সামাজিক বিবর্তনের কর্মপ্রবাহে। আজ বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা—শিক্ষার দুরবস্থা। ইহার

পদ্ধতিতে আবশ্যক আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রধান রূপ হওয়া উচিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন নয়, আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও প্রসার। 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রচেষ্টার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' তাহারই প্রতিষ্ঠানগত রূপ। ইহা কোনো ন্যাশনাল লেবরেটরির বা ইনষ্টিটিউটের বাঙলাদেশীয় সংস্করণ নয়। বাংলাভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি ইহাকে তাহার নিজস্ব কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করে ও লালন করে তাহাতেই হইবে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার উপযুক্ত সার্থকতা।*

* আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—বর্তমান প্রবন্ধটি তাহা হইতে গৃহীত।—সম্পাদক, **পরিচয়**।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞানের সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে

মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু' বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে, শত্রুব্যূহের মধ্যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এ-সব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণীদেহের উপাদান-সমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরি করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সব জিনিস তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃসংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এটি যে, দৃশ্যতঃ কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ুস্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলেছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কিনা। রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদি বস্তুর আবিষ্কার করেছে সে কথা আমি আগেই বলেছি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন্, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুইটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশ গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতি তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভীতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশি। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচে নি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকেরা আবার

কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এ-স্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যত ঘন কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাতে ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য সহবস্থায় কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতুযষ্ঠির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্ত দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই, অগ্নিকুণ্ডের জলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে, সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশ ঘাতপ্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম-সমূহ এই ক্ষেত্রে খাটান যায় কিনা, সে বিষয়েও আলোচনা শুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে নিউটন গতিবিজ্ঞান যে রকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগান গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সেই নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগান একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড় বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্যে সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড় পদার্থ। জড় পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অবস্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ দরকার হয়, সাধারণ কয়েকটির আচরণ আমরা গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপবিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণত নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই

অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতিবিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মকানুনের মতো অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূল জড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ-বৈজ্ঞানিক নিয়মই ঐ রকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হবে। কিন্তু উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে যে সে নিশ্চয়তা খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যায়। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড়জগতকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি ধর্ম থেকে যে সব জাগতিম নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে উপনীত হচ্ছেন সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসান সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়মরূপেই সেগুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরো ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতি আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গ বিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে

একটা বিচ্ছেদহীন অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু ও বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোটবড় নানা রকমের ঢেউ উঠতে পারে এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউ-এর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারের তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে এক স্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউ-এর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউ-এর তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথার তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা নীহারিকা থেকে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, সে শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার পথে আনীত সূর্যের কিরণরাজি। আলোকতরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড় পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথারতরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাত ও আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি তা নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানবপ্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে

গণিতজ্ঞরেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন; ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটি উত্তর তখনো মেলে নি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী, নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতো ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়মমাত্রেই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন। তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয় চিন্তা করতে শুরু করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়সঙ্কটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে সব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোকতরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটি এই। যদিও আলোকবিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে

বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। এই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি, এই ভাবের একটি কল্পনা দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হয়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোককণাবাদে উপস্থিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই Quantum theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেকট্রন যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এক একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড় পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জন করে, এক একটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নীলস বর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সহিত পর্বযুগের বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হবে।

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সঙ্কটের কথা মূখ্যত এই—আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে, এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই এক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, তার মানে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরো সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রনকে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা করে আসছিলুম, তবু টমসন-গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, সময় বিশেষে ইলেকট্রনের স্রোতকে তরঙ্গধর্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময় বিশেষে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেকট্রনের স্রোত অনেক সময় সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে একটা

বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মতো কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন অল্পায়তন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা হচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউ সমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময় সেটি ঠিক জড়ের মতো কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারৎ খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ এই মাপজোপের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি, তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায়, নিত্যনতুন আবিষ্কারের লালসায়, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে। এই বোঝাপড়ার বিষয়ে পরে কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

[পরিচয়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮ হতে পুনরমুদ্রিত। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের এটি প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনা।]

বিজ্ঞানীর নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ

১৯৬৩ সালের ১০ই অক্টোবর, যেদিন মস্কোতে জলে, স্থলে ও উর্ধ্বাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, সেদিন নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি ঘোষণা করলেন ১৯৬২ সালের শান্তি পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যামেরিকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লাইনাস কার্ল পাউলিং। ১০ই ডিসেম্বরের স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করলেন। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে, তার পরীক্ষাও এ বৎসরে পরীক্ষা বন্ধ চুক্তির জন্য আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিজ্ঞানী পাউলিং এই শান্তি পুরস্কার পেলেন।

অধ্যাপক পাউলিং একমাত্র পুরুষ যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে রাসায়নিক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে একজন মাত্র মহিলা দুবার নোবেল পুরস্কার (পদার্থ বিজ্ঞানে ও রসায়নে) পেয়েছিলেন, তিনি হলেন পোল্যাণ্ডের মেরি কুরী।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও অস্ত্রনির্মাণ নিষিদ্ধকরণের সংগ্রামে অধ্যাপক পাউলিং যে বিপুল সাহস ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান পৃথিবীতে তার তুলনা খুবই বিরল। কাজেই নোবেল কমিটি শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সবচেয়ে যোগ্য মানুষটিকেই পুরস্কৃত করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লাইনাস পাউলিং-এর মতো বোধ হয় আর কেউ এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন নি। অণুর গঠন এবং অণু গড়ে উঠেছে যে পরমাণুদের সমবায়ে, তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক সংযুক্তি (binding) সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাবলীর মূলে পাউলিং-এর বিরাট অবদান রয়েছে। যাঁরা রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম জটিল তত্ত্ব 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের'

পদ্ধতিকে সর্বপ্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই প্রচেষ্টার ফলে রাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞান (chemical physics) নামে বিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। অণুর সংযুক্তি (molecular bonds) সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্যে পাউলিং ১৯৫৪ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সাম্প্রতিক কালে পাউলিং বৃহৎ অণু বিশেষ করে আমিষজাতীয় পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী 'x-ray diffraction' পদ্ধতির সাহায্যে আমিষজাতীয় পদার্থের কেলাস (crystal) গঠন বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া 'ব্যাধির রসায়ন' বিষয়ে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তিনি কর্মরত এবং 'আণবিক জীব-বিজ্ঞানের' (molecular biology) সমগ্র ক্ষেত্র বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখকরূপেও পাউলিং-এর খ্যাতি কম নয়। তাঁর চারখানি বই The Nature of the Chemical Bond, General Chemistry, Quantum Mechanics (উইলসনের সঙ্গে যুক্তভাবে) এবং Line Spectra (গুডস্মিতের সঙ্গে যুক্তভাবে) আপন আপন ক্ষেত্রে ক্লাসিকের পর্যায়ে পরিগণিত হয়ে থাকে।

পাউলিং বর্তমানে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

১৯৫৮ সালে পাউলিং No More War নামে একখানি বই লেখেন। পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোর অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বইটিতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ক্রমিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার ফলে মানবদেহের ওপর যে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, পাউলিং বিশদভাবে তা বর্ণনা করেন। তাঁর মতে শুধু ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা পৃথিবীতে ঘটেছে তারই ফলে প্রায় কুড়ি লক্ষের মত শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে এবং ক্রমিক ভাবে পরীক্ষা কাজ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যত বংশ-ধরদের ক্ষেত্রে তার প্রভাব আরো ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। সরকারী বিরূপতার জন্যে সমগ্র আমেরিকায় বইটির কোনো প্রকাশক পাওয়া যায় নি।

১৯৫৮ সালে পাউলিং পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা পরিচালনার জন্যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

১৯৬০ সালে পাউলিং স্টকহোমে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্যে তিনি যে আবেদনপত্র প্রচার করেন, তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন পৃথিবীর উনপঞ্চাশটি দেশের এগার হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিক। 'অমার্কিন কার্যকলাপ অনুসন্ধান কমিটি' পাউলিংকে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বলে অভিযুক্ত করে এবং যে সব আমেরিকান বিজ্ঞানী আবেদনপত্র রচনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের নাম প্রকাশের জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়। পাউলিং সে কমিটিকে জানিয়ে দেন, তাঁকে এ জাতীয় প্রশ্ন করার কোনো অধিকার তাদের নেই। যে বাষট্টিজন প্রখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের জন্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন, পাউলিং তাঁদের অন্যতম।

১৯৬২ সালে মস্কোতে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যে বিশ্ব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার একজন প্রধানতম উদ্যোক্তা।

শুধু বিজ্ঞানীরূপে নয়, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন মহান ও অতন্দ্র যোদ্ধারূপে পাউলিং-এর অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬২ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন আন্তর্জাতিক রেডক্রস্ কমিটির চেয়ারম্যান সুইস নাগরিক মিঃ লিওপোল্ড পেরসিয়ার এবং রেডক্রস সোসাইটি লীগের কানাডীয় চেয়ারম্যান ডঃ জন মেকালে।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

তিনজন জার্মান বিজ্ঞানী একত্রে পদার্থবিদ্যায় ১৯৬২ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন পি. উইগনার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারিয়া গোয়েপার্ত-মেয়ার এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্স ডি. জেনসেন। পুরস্কারের অর্থের অর্ধাংশ পাবেন অধ্যাপক উইগনার, অপর অর্ধাংশ বাকি দুজন।

উইগনার পুরস্কার পেলেন পরমাণুকেন্দ্রীন ও মৌলিক বস্তুকণিকাদের তত্ত্বপ্রণয়নে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্যে। গোয়েপার্ত-মেয়ার ও জেনসেন

পুরস্কার পেলেন পরমাণুকেন্দ্রীনের মণ্ডলাকৃতি গঠন বিষয়ে (shell structure) তাঁদের আবিষ্কারের জন্যে।

রসায়নবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক কার্ল জিয়েগলার ও ইতালীর অধ্যাপক গিউলিও নাট্টাকে। তাঁরা দুজনেই High polymer বিষয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার পেলেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার যুগ্মভাবে লাভ করেছেন দুজন ব্রিটন ও একজন অস্ট্রেলিয়াবাসী। তাঁরা হলেন কেম্ব্রিজের অধ্যাপক লয়েড হজকিন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রু ফিল্ডিং হাক্সলি ও ক্যানবেরার সার জন ক্যারু একেলস্। মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নতুন আলোকপাতের জন্যে তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনার প্রভাবে স্নায়ুকোষে যে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, অধ্যাপক হজকিন ও হাক্সলি তার আংকিক সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এই সূত্রাবলীর সাহায্যে স্নায়ুকোষের বিভিন্ন ঘটনাবলী পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। স্নায়বিক উত্তেজনা একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে কিভাবে সঞ্চারিত হয়, একেলসের গবেষণায় সে বিষয়ে নতুন আলোকলাভ করা সম্ভব হবে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

মহানগর

সত্যজিৎ রায়ের মহানগর দেখতে গিয়েছিলাম, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মনে কিছুটা সংশয় নিয়েই।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি বিচারের মানদণ্ড, সত্যজিৎ রায় নিজেই। সংশয় ছিল এই মানদণ্ডে মহানগর উৎরাবে তো?

সত্যজিৎ রায়ের প্রায় ছবি সম্পর্কেই অবশ্য সমালোচক মহলকে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো মত পোষণ করতে দেখা যায়। মহানগর তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের অনুরাগী (বর্তমান লেখক যার মধ্যে পড়েন) তাদের মধ্যেও এবারে বিরূপ গুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলাম, সংশয় জেগেছিল এই কারণেই। মহানগর দেখে সে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়েছে বলতে পারলে খুশী হতাম। অথচ, মহানগর আমাকে হতাশ করেছে, একথা বললেও মিথ্যে কথা বলা হবে। বস্তুত পক্ষে সত্যজিৎ রায়ের যে কোনো ছবি অন্য বাংলা ছবির তুলনায় এত বেশি নিখুঁত যে—'হতাশ হয়েছি' সে ছবি সম্পর্কে একথা কিছুতেই বলা যায় না।

বলতে কি, মহানগরের টাইটেল দৃশ্য—ট্রামের ট্রলির বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া—মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। এবং ছবির প্রথমার্ধে সে প্রত্যাশা পূরনের আভাসও পেয়েছিলাম।

মহানগরের প্রথমার্ধ প্রায় নিখুঁত। সুব্রত-আরতি-প্রিয়গোপালদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারটি আশ্চর্য বাস্তব হয়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় যে মানবমনের কত দক্ষ কারুশিল্পী তার পরিচয় পাওয়া যায় আরতির চাকরি পাওয়া এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর সংস্থান থেকে। সুব্রত, তার মা, প্রিয়গোপাল, বাণী, পিণ্টু—প্রত্যেকের মনে আরতির চাকরি পাওয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কয়েকটি সংলাপ, কয়েকটি টুকরো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ঘটনা নির্বাচনে, দৃশ্যসংস্থানে, রূপকের মৃদু ব্যবহারে—আশ্চর্য সিদ্ধি অর্জন করেন সত্যজিৎ। মনে হয় না ছবি দেখছি—স্পন্দমান জীবনেরই যেন একটি টুকরো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অবশ্য আজকের দিনে, ঘরের বৌ-এর চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে সংসারে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা তা নিয়ে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। আর রেডিওর সংবাদে যখন শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী বলে উল্লেখ করতে শোনা যায় তখন ঘটনাকাল আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে বলেও এ-অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু ছবির পরবর্তী অংশে সত্যজিৎ রায় যেন থেই হারিয়ে ফেলেন। যা ছিল একান্তভাবে পারিবারিক নাটক এবং পারিবারিক নাটক হিসাবেই যা শেষ হলে, মনে হয়, সার্থক হত—তাকে আপিসে টেনে এনে এবং আপিসের সংঘাতে আরতির চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌছতে গিয়ে সত্যজিৎ যেন অনিশ্চিত পা ফেলে এগোন। ঘরের আরতি যতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক বাইরের আরতি তা নয়। এবং সহকর্মীর অপমানে আরতির হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়াটাও বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। এর জন্য দায়ী প্রধানত চিত্রনাট্য। ছবির প্রথম অংশে সত্যজিৎ প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন শেষ অংশে তা দেন নি। শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন—তার ফলে build-up অসম্পূর্ণ থেকেছে। শেষাংশ তাই একান্ত প্রক্ষিপ্ত মনে হয়, প্রথম অংশের সঙ্গে তার আত্মিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-ছবি সমগ্রভাবে শেষ পর্যন্ত তাই তৃপ্তি দিতে অপারগ হয়।

মহানগরের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার অভিনয়াংশ। প্রায় প্রত্যেকেই সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু বিশেষ করে মনে পড়ে প্রিয়গোপালের ভূমিকায় হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির মতো—এ-ছবিতেও শিশুচরিত্রগুলি আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। সত্যজিৎ রায়ই সম্ভবত একমাত্র পরিচালক যিনি শিশু-চরিত্রকে দেখেন শিশুর চোখ দিয়েই, বয়স্কের চোখে নয়।

প্রদ্যোৎ গুহ

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

চিত্রভাষা ও সমকালীন শিল্পী

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন ভারতীয় শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধে (চৈত্র ১৩৬৯) কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। পাঠক হিসেবে আমার নিজস্ব জবাব আমি পেশ করছি।

বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় চিত্রভাষার সমান্তরাল দৃষ্টান্তরূপে মাতৃভাষার প্রসঙ্গে এসেছেন। তাঁর মতে মাতৃভাষার মতো আপন চিত্রভাষার প্রতিও মানুষের নাড়ীর টান ও তাতে তার জন্মগত অধিকার আছে। এবং আপন মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যখন আজও আমাদের দেশে প্রকাশ পাচ্ছে, ঠিক তখনি হঠাৎ চিত্রভাষায় আমরা বিপরীতরূপে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছি কেন? কিন্তু মাতৃভাষার সঙ্গে চিত্রভাষার একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকায় এই তুলনা যথার্থ নয় বলেই আমি মনে করি। একদিক থেকে, লেখ্য বা কথ্য ভাষার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে একপ্রকার স্থূল প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। বাংলা হরফে যতদিন বাংলা লেখা হবে, বিদেশী শব্দের হাজারো আমদানী সত্ত্বেও বাংলা বাংলাই থাকবে। অ আ ক খ সহযোগে শব্দনির্মাণ করে যতদিন কথা বলব, ততদিন বাংলাতেই কথা বলব। কিন্তু ভাষা বলতে যদি বুঝি তার আন্তর রূপ, কথাশৈলী, আঙ্গিক ও পদবিন্যাস, তবেই চিত্রভাষার সঙ্গে তার তুলনা চলবে। ভাষার এই গুণগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ও বহিরাগত ভাষার প্রভাবে যেমন নিয়তই বদলাচ্ছে, চিত্রভাষারও তেমনি অহরহ রূপান্তর ঘটছে। এবং তথাকথিত ভাষার চেয়ে চিত্রভাষা যে বেশি আন্তর্জাতিক একথা অনস্বীকার্য। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার যে দুরধিগম্য ব্যবধান যা বিদেশী ভাষা শিক্ষা বা অনুবাদ ব্যতিরেকে লঙ্ঘন অসম্ভব, সুকুমার শিল্পে তা অনুপস্থিত। অপরপক্ষে, ভাষার আন্তর রূপ, শৈলী, আঙ্গিক ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে কি সুকুমার কলায় আবহমান কাল দেশ-বিদেশের মধ্যে যে নিরন্তর মালাবদল চলেছে তা সহজেই চোখে পড়ে। এই দিক থেকে আধুনিক একটি সার্থক বাংলা কবিতা এবং 'আন্তর্জাতিক' শৈলীতে আঁকা কোনো

বাঙ্গালী শিল্পীর একটি রসোত্তীর্ণ ছবি—এ দুয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ নেই। সুতরাং মাতৃভাষা ও চিত্রভাষার আপেক্ষিক কৌলিন্য ও বিশুদ্ধতার প্রশ্নটি এখানে অবান্তর।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ইউরোপের নব্য চিত্র আন্দোলনের ভারতীয়করণের নিশ্চয়ই পক্ষপাতী এবং তিনি যার নিন্দা করেছেন তা বোধ হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের অসামঞ্জস্য, চিত্রকলায় অতিরিক্ত ইউরোপপ্রীতির উগ্রতা। তিনি ১৩৪০ সালে অনুষ্ঠিত আর্ট রেবেল সেণ্টারের শিল্পপ্রদর্শনীকেই ইউরোপীয় শিল্পের ভারতীয়করণের প্রথম ও শেষ সার্থক প্রচেষ্টার সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য, নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে আজ নেতৃত্বের অভিমান ত্যাগ করার দিন এসেছে। এ-ক্ষেত্রে বোম্বাই-বরোদার দানও সামান্য নয়। প্রতিভাশালিনী শের-গীল থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কালের বহু শিল্পী প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ধারার সুষ্ঠু সমন্বয়ে যে রসসৃষ্টি করে চলেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সব শিল্পীর ভারতীয়ত্ব বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের পুরোধাদের মতো অতখানি সুস্পষ্ট নয়। "Our artists were never tiresomely reminded of the obvious fact that they were Indian; and in consequence they had the freedom to be naturally Indian in spite of all the borrowings that they indulged in." ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি উল্লেখিত শিল্পীবর্গের সার্থকতা অনুধাবনের সহায়ক। অজন্তার প্রাচীরচিত্রের দিকে তাকিয়ে যখন অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান শিল্পী "আহা কি সুন্দর!" বলে শস্তা অনুকরণে ব্যাপৃত, ঠিক তখনই শের-গীল তাঁর "বধূর প্রসাধন", "দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামবাসী" প্রভৃতি চিত্রে অজন্তার আন্তর রূপ প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। আবার কোথাও বা ফরাসী শিল্পী pure colour বা শুদ্ধ রঙের সঙ্গে রাজপুত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের সমন্বয়সাধন করে ভারতীয় শিল্পে নব ইতিহাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায় প্রভৃতি শিল্পীর অবদান তর্কাতীত, কিন্তু এই সব হোতাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টায় যখন অসংখ্য শক্তিহীন শিল্পী রক্তহীন শিল্পরচনায় রত, ঠিক তখনই শের-গীলের ছবি প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের অনির্বাণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও নবীনের এই সুসমন্বয় ঘটেছে শের-গীলের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালের কয়েকজন প্রকৃত শক্তিমান

শিল্পীর মধ্যেও। মাতিস ও লেগারের শিল্প-শৈলীতে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের নারীমূর্তির মাধুর্য ও রোমান্সের যেমন সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়েছে সিংহলী শিল্পী জর্জ ক্যেটের চিত্রে, তেমনি ভারতের লোক-সংস্কৃতি ও কৃষকজীবনের ভিত্তিতে এক নবীন শিল্প-সৌধ নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন কে. এস. কুলকারনি। অতি আধুনিক কালে গোয়ার শিল্পী লক্ষমন পাইয়ের চিত্রকলায় ইউরোপের দিকপাল শিল্পী মিরো ও ক্লির আঙ্গিকের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির সুমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশে রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যে মিশেছে ভারতীয় ভাস্কর্যের বলিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য আধুনিক মন এবং নীরোদ মজুমদারের চিত্রে রয়েছে ভারতীয় প্রাচীন পুরাণের দেবদেবী, কালীঘাটের পট আর ইউরোপীয় আঙ্গিকের এক অমৃত রসায়ন। এ ছাড়া সমসাময়িক কালে শিল্পীর সংখ্যা বিরল নয় যাঁরা শুধুমাত্র 'আন্তর্জাতিক' ভাষায় সার্থক চিত্রসৃষ্টিতে সক্ষম।

দেবব্রতবাবুর অপর একটি প্রশ্নের প্রসঙ্গ এখানে আসে। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংযোগহীন এই আন্তর্জাতিক চিত্রভাষার কি সার্থকতা? 'আজকের ভারতে নিরক্ষরতা অপরিসীম, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যাবস্থা, বুভুক্ষু সংখ্যাতীত, দরিদ্র কৃষিজীবী প্রধান, শ্রমজীবী মুষ্টিমেয়' এবং অগণিত দেশবাসীর জ্ঞানবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে এ কোন আকাশকুসুম রচনা করছে বর্তমান শিল্প? আমার মনে হয়, এ-সমস্যা আজকের নয়, উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ভারতীয় রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই এই ত্রুটির বীজ নিহিত। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সেই নবজাগৃতি অনিবার্য কারণেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ভারতীয় মনীষা সেদিন পূর্ব-পশ্চিমের মহামিলনে এক অপরূপ সংস্কৃতির সৌধ গড়েছিল, দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবী মানুষের অন্তরে তার রেশ-মাত্রও পৌছয়নি। তারপর সাধারণ শিক্ষার প্রসারের ফলে দেশের একটা বড়ো অংশ যখন শিক্ষিত হল, তখন তাদেরই বা কয়জন পেরেছে এই সংস্কৃতির পবিত্র শিখাটি দিয়ে আপন অন্দর আলোকিত করতে? মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদেশী শস্তা মুখরোচক শিল্পের আমদানী, যান্ত্রিকতা, ব্যবসায়িকতা, বিকৃতরুচি—এই সব আচ্ছন্ন করেছে সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের জীবন, যাদের কাছে, কি প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য, কি নবীন সংস্কৃতির গরিমা সমানভাবেই আবেদনহীন, অর্থহীন। এই সংকটে চিন্তাশীল, সুস্থরুচি; বুদ্ধিজীবী এক

সম্প্রদায় সংস্কৃতির ব্যূহসৃষ্টি করে তার মধ্যেই আত্মগোপন করল। এঁদের ভাষা, এঁদের চিন্তা তাই সাধারণের বোধগম্য নয়, আবার সাধারণের রুচি, আকাঙ্ক্ষাকে এঁরা অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে চলেন। দেশের উচ্চমানের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সবই এই Elite-এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হল। এই insularity-কে একপ্রকার অদৃষ্ট ভেবেই আমরা বেঁচে আছি। দেশের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান মেনে নিয়েই আমরা সংস্কৃতি-চর্চা করি। দেশের অধিকাংশ মানুষ বুঝবে না বলে আমরা উচ্চমানের শিল্পানুশীলন থেকে বিরত হই নি।

এ সমস্যাটি আজ জগদ্ব্যাপী, এদেশের বা দেশবিশেষের, বোধ হয়, নয়। পৃথিবীর এক সংখ্যালঘু, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখানেই শিল্প-সমস্যার আন্তর্জাতিকতা। এবং এই থেকে যে একটি আর্জাতিক চিত্রভাষার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এই গতি ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের যুগে আজকের শিক্ষিত, সচেতন ভারতীয় শিল্পী পশ্চিমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসতে পারে না। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে দুনিয়ার শিল্প-ইতিহাস মনের পশ্চাদপটে রেখেই সে আজ ছবি আঁকবে। আসলে, শিল্পী তুলি ধরবে সচেতনভাবে ভারতীয় হবার উদ্দেশ্যে নয়, আন্তর্জাতিক সাজবার জন্যেও নয়, তার লক্ষ্য হবে আত্ম-রূপায়ণ। যেটুকু ভারতীয়ত্ব সৎ শিল্পীর মজ্জার মধ্যে আছে, তা নিজের অগোচরেই শিল্পের মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হবে। আবার, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলে যেটুকু আন্তর্জাতিকতা আপন রক্তের মধ্যে সে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, তাও চিত্রপটে স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠবে। এবং তার শিল্পের উৎকর্ষ বিচার হবে তার অন্তর্লোক, রসদৃষ্টি ও সৃজনী কল্পনার মানদণ্ডে। নইলে যদি জাত্যাভিমান ভাবে আমিই দেবতা, বিজাতিপ্রীতি ভাবে আমি, তবে শিল্প-অন্তর্যামী মুখ-বুঁজেই হাসবেন।

মণি জানা, কলিকাতা

গ্রাম ও গ্রামীন অর্থনীতি

পরিচয়-এর নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, গ্রামের কৃষক ও গ্রামবাসীদের কথা, তাদের সমস্যা ও সমাধানের পথের বিষয়ে, কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি পরিচয়-এ প্রকাশ করুন। প্রচলিত

পত্রপত্রিকায় এ-ব্যাপারে সুস্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু 'পরিচয়'-এর মতো প্রগতিবাদী পত্রিকায়ও গ্রামীন কিংবা কৃষি-অর্থনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রবন্ধাদিরও কেন যথেষ্ট অপ্রতুলতা—এমন কি কচিৎ দেখেছি বলেই মনে হয়। সেকারণ আমার অনুরোধ গ্রামের কথা, গ্রামের মানুষের কথা, তাদের জীবনের শোচনীয় অবস্থার কথা ও মর্মন্তুদ হাহাকারের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে আপনারা চিন্তা করুন এবং সে-সম্পর্কে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা লিখিত প্রবন্ধাদি পরিচয়-এ নিয়মিত প্রকাশ করুন। কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি আমাদের খুবই তৃপ্তি দিয়েছে। গ্রাম ও গ্রামবাসী এবং কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কেও অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করে গ্রামের কথা চিন্তা করুন ও পরিচয়-এর পাঠকদের চিন্তিত করান। নইলে কেবলমাত্র শহরের কথা ও সেখানকার মানুষের কথা বললেই দেশের কথা বলা হয় না—আশা করি এ-ব্যাপারে আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন, নয় কি?

সৈকত মণ্ডল, ডায়মণ্ডহারবার

পুস্তক-পরিচয়

সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ প্রসঙ্গে

A Philosophy of Man by Adam Schaff : Lawrence & Wishart.

মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি সামাজিক দর্শন নয়, তা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববীক্ষা, অতএব ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসংক্রান্ত নীতিগত প্রশ্নেও এই দর্শনের দিঙ্‌নির্দেশ করতে পারা উচিত এই ধারণা যারা পোষণ করেন Adam Schaff-এর সাম্প্রতিক দর্শনগ্রন্থ A Philosophy of Man হাতে পেয়ে তারা আনন্দিত হবেন। বিষয়সূচীর উপর একবার চোখ বুলিয়েই বলা যায় যে এ-ধরনের বই মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রথম না হোক অতীব বিরল। "সুখের সন্ধান", "জীবনের অর্থ", "রাজনীতি ও নৈতিক দায়িত্ব" এ-জাতীয় বিষয় সাবেকী মার্কসবাদী দার্শনিক গ্রন্থে বিশেষ স্থান পায় নি বলেই আমার ধারণা। বইটি পড়ে অবশ্য নিরাশ হতে হয়। নতুন যে বিষয়গুলিকে মার্কসবাদী বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার উপর যে কোনো গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয় পাঠকের তা নয়। বস্তুত কিছু সমস্যা উত্থাপনই করা হয়েছে, তাদের কোনো সম্যক আলোচনা করা হয় নি। গ্রন্থকারের নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানতে পারা যায়, এই পর্যন্ত। তথাপি এই প্রাথমিক প্রয়াসের গুরুত্ব লাঘব করা উচিত নয়। বরং গ্রন্থকারকে অভিনন্দনই জানান্‌ উচিত দুঃসাহসের সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করার জন্য যা মার্কসবাদী দার্শনিকেরা এতদিন যাবৎ হয় উপেক্ষাভরে নয় ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেছেন। এই এড়িয়ে যাওয়ার ফল হয়েছে এই যে নানাবিধ বিজাতীয় ভাবধারা মার্কসবাদীদের চিন্তা ও নৈতিক আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। কারণ ভাবের ঘরে যদি চুরি সম্ভব না হয় তো সেখানে কোনো শূন্যতা (vacuum)-ও সম্ভব নয়। আমাদের দেশে মার্কসবাদ-পরিত্যক্ত ব্যক্তিগত জীবনের নীতি ও আচরণের ক্ষেত্র অধিকার করে বসে আছে সনাতনী হিন্দু আচার ও সংস্কার ও তার সঙ্গে কিছুটা বুর্জোয়া ইউরোপীয় আচার ও নীতি-ধারণার মিশাল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী মানুষের মধ্যে

বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই। এ-ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে এর কোনো গুরুত্ব এখনও স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার অ্যাডাম শাফ-এর সমস্যাটা এই যে পোল্যাণ্ডের ইনটেলেক্‌চুয়াল মহলে সম্প্রতিকালে এই শূন্যতাটা অধিকার করেছে অস্তিত্ববাদ, বিশেষ করে সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ। তাঁর গ্রন্থটি লেখার পিছনে মূল অনুপ্রেরণাই এই সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের অভিযানের পথ রুদ্ধ করা। সার্ত্রের নিজের জবানীতে মার্কসবাদের যেখানে শেষ অস্তিত্ববাদের সেখানে শুরু। এখানে মার্কসবাদ বলতে সাবেকী মার্কসবাদ এবং অস্তিত্ববাদ বলতে সার্ত্রের দর্শন বুঝতে হবে। সাবেকী মার্কসবাদ ব্যষ্টির আলোচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে, তার ভিত্তিতে ইতিহাসের গতিবিচার করছে, কিন্তু ব্যক্তির সীমানায় এসে তা থমকে দাঁড়াচ্ছে। অস্তিত্ববাদের বিষয়বস্তু একক ব্যক্তি। সুতরাং অস্তিত্ববাদ মার্কসবাদীর কাছে গ্রাহ্য হোক আর নাই হোক, সাবেকী মার্কসবাদের মূলসূত্র অনুসারেই অস্তিত্ববাদের তাবৎ ইমারত একেবারে ধসে পড়ে না। কিন্তু শাফ-এর মত, এবং আমি তাঁর মতের সঙ্গে একমত যে, মার্কসবাদ একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববীক্ষা। সাবেকী মার্কসবাদ যদি একক ব্যক্তিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে তো সেটা তার অসম্পূর্ণতা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের চাপে এই অসম্পূর্ণতা বোধযোগ্য ও ক্ষমার্হ হলেও আজ তা অতিক্রমণের সময় এসেছে। তাই সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের খণ্ডনপ্রয়াসে শাফ সাবেকী তূণের থেকে শর সংগ্রহ না করে মার্কসবাদের মূল সূত্রের ভিত্তিতে নতুন একটি তত্ত্বের সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন যা ব্যক্তির জীবনপ্রশ্নের ও নীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই চেষ্টা সফল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদও নস্যাৎ হয় নি, কিন্তু তবু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে, সেজন্য শাফ-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাঁর যুক্তিতে ছিদ্র আবিষ্কার করার চেয়ে মূল্যবান নতুনত্ব যা যা আছে তার দিকেই বেশি মনোযোগ দেব।

শাফ-এর বইয়ে সর্বাগ্রে যা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা তাঁর মুক্তদ্বার মনোভঙ্গি। অস্তিত্ববাদের সমালোচনায় নেমে প্রথমেই তিনি যা স্বীকার করে নেন তা এই যে পোল্যাণ্ডের বহু শিক্ষিত মহলে যদি অস্তিত্ববাদ প্রভূত প্রভাব অর্জন করে থাকে তো তা ঐতিহাসিক কারণবিবর্জিত নয়। পার্টি নেতাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে মনে করে বহুদিন যাবৎ যারা নিজেদের এবং

কখনও কখনও অপরেরও বিবেকের টুঁটি চেপে ধরে রেখেছিল স্তালিনীয় দুঃশাসনের ইতিহাস প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর স্বভাবতই তাদের অনেকের মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে একক ব্যক্তি হিসেবে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে এবং সাবেকী মার্কসবাদ কোনো সাহায্য এই বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসুদের দিতে পারে নি। অস্তিত্ববাদই দর্শন হিসেবে প্রস্তুত ছিল ঠিক এই জাতীয় সমস্যার আলোচনার আধার হিসেবে এবং তার প্রভাব অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাফ-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি এই যে অস্তিত্ববাদ সমস্যাহিসেবে যে সব বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপৃত তা মার্কসবাদের কাছেও সমস্যা হিসেবে গ্রাহ্য। সাধারণ সূত্র হিসেবেই তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেন যে ভ্রমাত্মক দর্শনও নির্ভ্রম দর্শনসমস্যার উত্থাপন করতে পারে। অস্তিত্ববাদ গ্রাহ্য না বলেই অস্তিত্ববাদ যে ধরনের সমস্যার উত্থাপন করে তা মার্কসবাদী দার্শনিকের প্রণিধান দাবি করে না এ-মত অগ্রাহ্য। মার্কসবাদী নিশ্চয়ই মনে করবেন যে মার্কসবাদই একমাত্র নির্ভুল দার্শনিক মার্গ কিন্তু একথা বললে হাস্যকর হবে যে এ-মার্গের উদ্ভাবনের আগে দুই সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যত দর্শনচিন্তা ও আলোচনা হয়ে এসেছে—শুধু জড়বাদী নয়, ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী মার্গেও—তাতে বিষয় হিসেবে খাঁটি কোনো সমস্যা নেই!

শাফ-এর উদার মনোভাব প্রশংসনীয়, কিন্তু উদারতার ঝোঁকে তিনি একটু বেশিদূর চলে যান বলে মনে হয়। "জীবনের অর্থ কি", বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের স্থান কোথায়" ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্নের অবতারণা করে তিনি একই কালে মার্কসবাদী ও নিও-পজিটিভিস্টদের সমালোচনা করেন এই বলে যে তারা কখনও এ-জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চান নি, দ্বিতীয় বর্গের দার্শনিকেরা এদের উপ-সমস্যা (pseudo-problems) বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু উপ-সমস্যার ব্যাপারে নিও-পজিটিভিস্টদের বক্তব্যের প্রতি আংশিকভাবে হলেও আমি আস্থাশীল। "জীবনের অর্থ কি?" জাতীয় প্রশ্নকে দার্শনিক প্রশ্নের সমগোত্র বলে নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া চলে না, "অর্থ" কথাটিই এখানে অর্থহীন এবং নিও-পজিটিভিস্ট যদি বলেন যে এ-জাতীয় জিজ্ঞাসার স্থান দর্শনে নয়, তার স্থান কাব্যে, শিল্পে, ধর্মশাস্ত্র ও পৌরাণিক উপাখ্যানে তো তাও মেনে নিতে আমার দ্বিধা নেই। শাফ নিজেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি এদের দার্শনিকসমস্যা হিসেবে আলোচনা

করার প্রচেষ্টায়। অনিবার্যভাবেই এদের প্রসঙ্গে অত্যন্ত ভাসা ভাসা রকমের কিছু কথাই বলেছেন মাত্র যা বলতে দর্শনশাস্ত্রে কোনো অধিকারের প্রয়োজন হয় না।

অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে শাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। সাবেকী নীতিতত্ত্বে নৈতিক সংকটের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমন অবস্থার আলোচনা নেই যাতে ভালো-মন্দের মানভেদ থেকে উদ্ভূত হয় এমন সমস্যা যার কোনো নির্দিষ্ট সমাধান নেই, থাকতে পারে না। এ-জাতীয় to be or not to be-র সমস্যাকে দার্শনিক বিচারের কেন্দ্রে আনাকে অস্তিত্ববাদের একটি মূল্যবান অবদান বলে তিনি অভিবাদন করেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদ প্রশ্নটিকে ঠিকমতো তুললেও ভুলভাবে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে এ-কথাটি বার বার বললেও কখনই তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন না। তাঁর প্রধান আপত্তি সার্ত্রের ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা সম্পর্কে। শাফ লেখেন, "সার্ত্রের মতে, কিছু কিছু আবশ্যিকতাকে পরিবেশ, জাগতিক নিয়মের আকারে ব্যক্তির উপর চাপায়। কিন্তু একই কালে, ব্যক্তিরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। তাঁর (সার্ত্রের) ডায়ালেকটিক্‌টি হল এই ধরনের।" শাফ একে অত্যন্ত হীন ডায়ালেকটিক্‌ বলে অভিহিত করেন। কেন তা ব্যাখ্যা করেন না। অথচ সার্ত্রের উপর আরোপিত ধারণাটা মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা বলেই আমরাও অনেকে মনে করে এসেছি। শাফ যান্ত্রিক জড়বাদের সমর্থন করছেন না। ব্যক্তি জড়শক্তিদের দ্বারা চালিত পুত্তলিকাবিশেষ তা বলছেন না। অপরদিকে সার্ত্রও একথা বলছেন না যে পরিবেশের প্রভাব মানুষ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং শাফ ও সার্ত্রের মধ্যে মতভেদটা যদি শুধুই বাক্যনির্বাচনগত না হয়ে থাকে তো তা ঠিক কোথায় তা একেবারেই পরিষ্কার করে দেখানো হয়নি। একথা ঠিক যে পরিবেশের প্রভাবে সীমানা মেনে নেওয়ার পর ব্যক্তির নিজ আচরণের জন্য তার নিজস্ব দায়িত্বের উপর সার্ত্র প্রচণ্ড জোর দেন—বস্তুত এই দায়িত্বের ধারণাটাই সার্ত্রীয় নীতিধারণার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু শাফও তো নিজেই লেখেন, "আমি বন্দী অবস্থায় মৃত্যু-দণ্ডের অপেক্ষায় থাকতে পারি। তবু আমার নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে। আমি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারি অথবা মাথা উঁচু রেখে মৃত্যু বরণ করতে পারি। আমি এখনও স্বাধীন।" ঠিক এই অর্থেই কি সার্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলেন না? তাহলে প্রভেদটা কোথায়?

পরিবেশ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যে ধরনের সীমানা আরোপ করে, তাকে উপেক্ষা সার্ত্র কোনখানে করেছেন? কামুকেও কি তিনি এই-ই বলেন নি যে, তোমার স্বাধীনতার ধারণা অলীক। আমরা সকলেই খাঁচায় বন্দী। তার মধ্যে বড়জোর তুমি একটু কম জনাকীর্ণ অঞ্চল বেছে নিতে পার। কিন্তু একমাত্র স্বাধীনতা যা আছে তা "স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে রত হওয়ার স্বাধীনতা?" শাফ-এর অন্য আপত্তির কারণ সার্ত্রের ধারণায় ব্যক্তির একাকিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান, তাতে despair, anguish প্রভৃতি কিছু নেতিমূলক ভাবকে মেনে নেওয়ার দিকে ঝোঁক। কিন্তু এখানেও শাফ-এর আপত্তি খুব ধোপে টেঁকে না। একথা ঠিক যে কয়েকটি অত্যন্ত ভাবাবেগে ভরপুর বাক্যকে অযথা গুরুত্ব প্রদান করে সার্ত্রীয় দর্শনে একটি মনোলোভা রোমান্টিকতার আমেজ আনা হয়েছে এবং যদিও ব্যক্তিকে কর্মে প্রেরণা দেওয়াই যে-দর্শনের মূল লক্ষ্য তাতে আবেগের স্থান থাকাটা অবাঞ্ছনীয় নয় তথাপি শাফ-এর সমালোচনা স্বীকার্য যে নিছক শাস্ত্রীয় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এ-জাতীয় ঝোঁক বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু বিরক্তি মেনে নেওয়ার পর এই বাক্যগুলির দরুণই সার্ত্রীয় দর্শন নস্যাৎ হয়ে যায় কিনা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। এখানে স্মর্তব্য যে-বাক্যগুলি সাধারণত যে ভাব ও অর্থ বহন করে থাকে সার্ত্রীয় দর্শনে সেই ভাব ও অর্থ তারা বহন করে না, এবং তাদের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্কে আপত্তিও ঘুচে যায়, প্রশ্ন যা থেকে যায় তা শুধু তাদের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে। মানুষ 'একাকী' বলতে যদি এই বোঝা হয় যে মানুষ সমাজসম্পর্কহীন; একদিকে মানুষ একা অপরদিকে গোটা জগৎ সংসার, ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে ব্যষ্টিমানুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র নিরন্তর সংগ্রামের, তা নিশ্চয়ই মার্কসবাদীর জীবনবোধের বিরুদ্ধগামী হবে কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সখ্যভাব সম্ভব। প্রেম ভালোবাসা মিথ্যা নয়। একথা ঠিক যে প্রত্যেক মানুষই মনের একটি গভীরের তলে একেবারেই একাকী, সেখানকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করার বা কারও বোধে আনার কোনো মাধ্যমই তার নেই কিন্তু এও ঠিক যে মানুষ যে পরিমাণে ভালোবাসতে পারে, যে পরিমাণে মনে সৌহার্দ্য, সহানুভূতি সহৃদয়তা ও করুণার উদ্রেক করতে পারে অথবা যে পরিমাণে মানুষ শিল্পী বা কবি সেই পরিমাণে নিজের ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সে সেতুবন্ধনে সমর্থ হয়। কিন্তু একাকী বলতে সার্ত্র সম্পূর্ণ অন্য জিনিস বোঝেন, মানুষ বন্ধুতা সম্ভাবনা-

হীন একথা আদপেই তাঁর বক্তব্য নয়। তাঁর চিন্তায় ব্যক্তিমানুষ একাকী কারণ যে-কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও সেই অনুসারে আচরণ করার দায়িত্ব ব্যক্তিকে একক ভাবেই নিতে হয়, সেখানে যুগল বা যৌথ দায়িত্বের কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ পরিবেশ থেকে ব্যষ্টি থেকে যে প্রকারের ও যে পরিমাণের প্রভাবই ব্যক্তির উপর বর্তাক, যৌথ চেতনা বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যতক্ষণ না স্বীকার করা হচ্ছে ততক্ষণ অস্তিমে "to be" অথবা "not to be"-র সিদ্ধান্ত বা অন্য যে-কোনো লঘুগুরু সিদ্ধান্তই ব্যক্তিকে অস্তিমে এককভাবেই নিতে হয়। কারণ প্রভাব বা প্ররোচনা, উপদেশ ও মন্ত্রণা, তা যাই হোক এবং যেই দিক না কেন, তদনুসারে আচরণ করা না করাটা নির্ভর করছে ব্যক্তিরই উপর। তেমনি সার্ত্রীয় দর্শনে despair বা আশাশূন্যতা pessimism দ্যোতনা করে না। ব্যক্তি যখন উপরোক্ত অর্থে একাকিত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, যখন হৃদয়ঙ্গম করে যে কোনো গীর্জার অনুশাসন, কোনো পার্টির নিয়মাবলী, কোনো গুরুজনের উপদেশাবলী অন্তিমে তার হয়ে তার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তার কৃতকর্মের দায়িত্ব সম্পূর্ণই তার, তখন তার মনে যে ভাব জাগে তার নাম দেওয়া হয়েছে আশাশূন্যতা। এই জাতীয় বাক্যের ব্যবহারে একজাতীয় বাক্যবিলাসে রত হওয়া হচ্ছে এই সমালোচনা করার পর মৌলিক কোনো আপত্তি এদের সম্বন্ধে মার্কসবাদীর উত্থাপন করার থাকে না। শাফ অন্যত্র সার্ত্রের সমালোচনা করেন এই কারণে যে সার্ত্র মন্তব্য করেছেন যে-কোনো ঘটনার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করতে বিশেষ ঐতিহাসিক বিন্যাস সূক্ষ্মভাবে বিচার্য, শুধু মোটাভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজলে চলে না। শাফ অভিযোগ করেন সার্ত্র ঐতিহাসিক law মানেন না আর এ-জাতীয় law না মানলে মার্কসবাদের কিছুই বাকী থাকে না। কিন্তু শাফ যে অর্থে historical law-এর কথা বলছেন তাকি সত্যিই মার্কসবাদে স্বীকৃত? সার্ত্রীয় ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাকে অস্বীকার করে মার্কসবাদীর কাছে গ্রাহ্যরূপে স্বাধীনতার যে ধারণাকে তিনি প্রস্তাব করেন তা হল, "A man is free when he is able to choose one of several alternative courses of action." গোলমাল বাধে এজন্য যে তিনি অস্তিত্ববাদী ধারণা বলে নাকচ করেন যে-ধারণাকে তাকে এভাবে সূত্রাকারে প্রকাশ করেন: "A man is free when his will to act is not determined by anyone or anything." দ্বিতীয় সূত্রটিকে অস্বীকার

করে প্রথমটিকে যদি গ্রহণ করা হয় তো তার মানে হয় এই যে ব্যক্তির "will to act is determined", কিন্তু তথাপি "he is able to choose one of several alternative courses of actions." আমার কাছে এ প্রস্তাবটি স্ববিরোধী বলে মনে হয়।

"রাজনীতি ও নৈতিক দায়িত্ব" শীর্ষক পরিচ্ছেদে শাফ অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেন. এমন একটি সমস্যার উত্থাপন করে যা শুধু পোলাণ্ডেই নয় সাম্প্রতিক ভারতবর্ষেও অনেকের মনকেই বিচলিত করছে। সমস্যাটি এই: কোনো পার্টির সভ্য যদি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন পার্টির অনুশাসন মেনে চললে তাকে এমন কাজ করতে হবে যা তার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভুল বা অন্যায়, এবং পার্টির নিজের লক্ষ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর, তখন তার কর্তব্য কি? শাফ নিজেই এখানে স্বীকার করে নেন যে এ অবস্থায় পার্টির সভ্যকে একক অবস্থাতেই নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অস্তিত্ববাদীরা যে অর্থে "একাকিত্বের" কথা বলেন সেই একাকী অবস্থায়ই। পার্টির অন্তিম লক্ষ্য ও সাধনার সিদ্ধিলাভে পার্টির ঐক্যের মূল্য কতটুকু তা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকেই নিজস্ব তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখতে হবে। যদি বিশেষ কোনো সভ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে পার্টির লক্ষ্যের স্বার্থেই পার্টির অনুশাসন অমান্য করা উচিৎ তো তাই, শাফ-এর মতে, হবে তার কর্তব্য। সাধারণ জনমত বা পার্টির অন্যান্য সভ্যদের মত কোনো কিছুই বিশেষ সভ্যের এই দায়িত্বের ভার লাঘব করতে পারে না। শাফ লেখেন, "এখানে যে দ্বন্দ্ব মূলত তা যৌথ অনুশাসন ও সত্যানুসন্ধানের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে লজ্জাকর মনে করে আমরা অনেক সময়ে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু তা ভুল। এ-একটি মানবিক সমস্যা…।" আরও বলেন, "যদি সর্ববাদীসম্মত যা শুধুমাত্র তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই, তো বিজ্ঞানে, আর্টে এবং রাজনীতিতেও কি আশা করা যেতে পারে? ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে বুদ্ধিগত অচলতা ও মতান্ধতায় আমরা ভেসে যাব।"

একই উৎসাহের সঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল পরবর্তী একটি অধ্যায়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা, বিশেষ করে শিল্পীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে শাফ-এর নির্ভীক মত প্রচার। শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর স্বাধীনতা অবাধই হওয়া উচিৎ (যদিও তিনি স্বীকার করেন

এমন অনেক ক্ষেত্রও আছে যাতে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই স্বাধীনতাকে সীমিত হতে হয়) এই কথা জোর করে বলার প্রয়োজন ছিল। গণিত বা পদার্থবিদ্যা বা বিশুদ্ধ সংগীতের কোনো বাদানুবাদে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত আর কারও অংশগ্রহণ করা উপহাস আমন্ত্রণ করা তো বটেই, সাহিত্য কাব্য বা চিত্রকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও শিল্পীদের উপরও যে ধরনের খবরদারি সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে করা হয়েছে তা যে একেবারেই শুভ নয় একথাও তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শের শুদ্ধতা রক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গেও তিনি যা বলেন তা আমাদের অনেকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে বিশেষ করে আমাদের মধ্যে তাদের যারা মনে করি ভারতবর্ষেও আদর্শের বিনিময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সাফল্য সন্ধানের বিপদ গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। পোল্যাণ্ডের বিশেষ অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শাফ বলেন, যতই থিয়োরি কপচান হোক না কেন, জনসাধারণের মনে বিদ্রোহ ভাব জাগেই যখন তারা দেখে, এবং নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ভাবে নয়, অন্যায়, চৌর্যবৃত্তি, জাতিবিদ্বেষ, রহস্যাশ্রিত চিন্তা ও আত্মম্ভরিতার উদাহরণ। বলা হয়, কিছুকালের জন্য এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এরই নাম কি সমাজতন্ত্র? অপর জায়গায় আমাদেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ আরও একটি ব্যাপারে আলোকপাত করে, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশানাকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের জঙ্গলে আদর্শকে হারিয়ে ফেলার প্রবণতা।" অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি এই প্রবণতার কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করেন, শুধু তাই না একে একটি আবশ্যিক গুণ হিসেবেও পাচার করে দিতে চেষ্টা করেন। শাফ বলেন এরা আসলে cynic, এঁদের practicality মুখোস মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদের অধ্যায়ে এসে কিন্তু শাফ একেবারেই অসতর্ক হয়ে পড়েন। একাধারে অনেকগুলি ভুল কথা একের পর এক বলে যান। তার কারণ মানবিকবাদ বা humanism বলতে কি বোঝানো হয় তা নিয়ে মনে হয় তিনি একেবারেই চিন্তা করেন নি। Humanism-কে তিনি humanitarianism মনে করে লেখেন, "সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ কোনো আনকোরা নতুন জিনিস নয়…প্রতি যুগেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত মানবিকবাদ ছিল। যে-কোনো যুগেরই বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী আন্দোলন,

যা সামাজিক অন্যায় ও অসমতা, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত তা অন্তিম বিশ্লেষণে মানবিকবাদে পরিনমণীয়। এই অর্থে প্রাচীনকালীন মানবিকবাদ, খ্রীষ্টধর্মের প্রথম যুগের মানবিকবাদ, রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেন্‌মেণ্ট ও ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের মানবিকবাদের কথা বলতে পারি।" তাঁর বক্তব্য অবশ্যই সর্বৈব ভুল। মানবিকবাদের ধারণাটি কি তার আলোচনা এখানে স্থানাভাবে অসম্ভব, কিন্তু তা যে মানবপ্রেম বা জীবে দয়া জাতীয় কিছু নয়, humanitarianism-এর থেকে যে তা একেবারেই পৃথক, কোনো ধর্মীয় মতবাদ ও মানবিকবাদ যে সহাবস্থান করতেই পারে না, তা জোর করে বলা যায়। এ-জাতীয় ভুল হামেশাই করা হয় মনে হয় এবং সেজন্যই প্রসঙ্গটি ইচ্ছে করে তুললাম। উদাহরণত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শারদীয় পরিচয়'-এ লেখেন যখন তিনি কারও মুখে শোনেন "এদেশের যে পরম্পরা, যে ঐতিহ্য, তার সঙ্গে মানবিকতারও (humanism) কোনো সামঞ্জস্য নেই, তখন…মন রুষ্ট আর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়।" এদেশের পরম্পরা ও ঐতিহ্য মূলত ধর্মীয়, মানুষের চাইতে দেবতা এবং ইহকালের চাইতে পরকালকেই এদেশের ঐতিহ্যে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই ধারণার বশবর্তী আমিও এই মত পোষণ করি যে এ ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবিকবাদের কোনো মৌলিক সম্পর্কই নেই। এ-ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু আরও অনেকেরই হয়তো এই ধারণা আছে। এ-ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ই কিছু লিখুন না, আমরা যারা কানে প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পড়িনি তারা উপকৃত হই। কিন্তু একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি: ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রে মানবিকবাদের স্থান আছে কি নেই তা বিচার করতে শুধু ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করলেই নিশ্চয়ই চলবে না, মানবিকবাদ (humanism) বলতে কি বোঝায় তাও নিশ্চয়ই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে।

অশোক রুদ্র

তবু প্রেম তবু প্রাণ। নমিতা বসু মজুমদার। প্রকাশক: ভবানীপ্রসাদ বসু। দু টাকা

দুপুর পর্যন্ত। রামগোপাল নাথ। মিত্রা প্রকাশন। দেড় টাকা

সাম্প্রতিক কালের বাঙলা সাহিত্যের কবিতা শাখাটি বিশেষভাবে প্রাচুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত কবিদের কবিতা

সংগ্রহ একটির পর একটি প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেগুলি যৎকিঞ্চিৎ সমাদরও লাভ করছে, এটা আশার কথা।

নমিতা বসু মজুমদার এবং রামগোপাল নাথ, আধুনিক কবিতার রচয়িতা হিসেবে দুটি নতুন নাম।

নমিতা দেবীর গ্রন্থে সংকলিত সবকটি কবিতাই গদ্য ছন্দে রচিত। কবিতাগুলিকে গ্রন্থমধ্যে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। আধুনিকতার নামে দুর্বোধ্য পরীক্ষার সচেতন প্রয়াস কোথাও লক্ষ্য করা যায় না, বরং একটা সহজ আন্তরিকতার স্পর্শ কবিতাগুলোর সর্বত্র। সার্থক গদ্য কবিতা রচনা করতে গেলেও ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ দখল থাকা চাই; নমিতা দেবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে অবশ্য কোনো কোনো স্থানে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ্য করা যাবে। কোনো কোনো স্থানে বিখ্যাত দু একজন কবির অস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু কবিতা কটির 'টোন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। বলিষ্ঠ আশাবাদে সংশয়হীন প্রত্যয়জাত উচ্চারণ কবির কলাকৌশলগত দুর্বলতাকে অনেক ক্ষেত্রে ছাপিয়ে উঠেছে। যেমন,

উজ্জ্বল প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠ আমরা
অন্ধকারের মানুষ,
শিল্পের আলো দেখব।" (শব্দ, মুঠো, বৃষ্টি)

এমন বহু উজ্জ্বল পংক্তি গ্রন্থপাঠে পাঠককে মুগ্ধ করবে। কিন্তু বইটির প্রচ্ছদরচনা ভালো নয়—তা আধুনিক রুচির পক্ষে পীড়াদায়ক।

রামগোপাল নাথের কবিতাগুলি অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্যছন্দে রচিত। কয়েকটি কবিতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ অগ্রজ কবিদের অনুসরণের প্রয়াসও দেখা গেল। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও কবি আধুনিকতাকে পরিহার করে কিছুটা পুরনোপন্থী। পংক্তি শেষে অন্ত্য-ক্রিয়াপদের মিল রবীন্দ্র-পূর্ব কাব্যধারার একটি বৈশিষ্ট্য; আলোচ্য বইটিতে এমন কিছু কিছু ব্যবহার আছে। নির্ভর, স্বপ্ন-সাধ, যাত্রী, পঁচিশে বৈশাখ প্রভৃতি কবিতা বেশ ভালো রচনা। সামগ্রিকভাবে কবিতাগুলোর সুরব্যঞ্জনা পাঠকের ভালো লাগবে। প্রচ্ছদপট সাধারণ স্তরের।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

চি ত্র প্র স ঙ্গ

ভারতীয় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়

"এখানে শিল্পচর্চা করতে এসেছি আমরা অধিকাংশ দুঃস্থ, দরিদ্র মধ্যবিত্তের দল। শৌখিন মনোবৃত্তি নিয়ে, শখের শিল্পচর্চা করতে এখানে আসেনি কেউ। অথচ ছবি সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলার মূলে কতো বাধা। একে আর্থিক সঙ্গতি কম, তায় কোহিনুরতুল্য মূল্যের কাছে আমরা পিছু হঠি। ব্যবসায়ীদের ফন্দিবাজিতে ন্যায্যমূল্যের চারগুণ ছয়গুণ মূল্য দিতে হয়।"—ধর্মতলা স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস্ অ্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ-এর ছাত্রসংসদ তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায় এসব কথা বলেছেন। আরও অনেক সমস্যা তাঁদের আছে: পুরনো নোনাধরা বাড়ি, ঘরগুলি স্যাঁৎসেঁতে, যথেষ্ট আলোর অভাব। এরই মধ্যে ছাত্ররা যে ছবি আঁকেন, সেইটেই তাঁদের শিল্পানুরাগের প্রমাণ। কিন্তু এঁদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল সরকারী উদাসীনতা। অর্থানুকূল্য তো দূরের কথা, "বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক দরিদ্রতা"র অজুহাতে কলকাতার এই পুরনো শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রটি সরকারী অনুমোদন পর্যন্ত পায়নি।

অগত্যা, এবারে তাঁরা তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়েছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে দিয়ে।—ব্যাপারটা খুব করুণ। এবং, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক মস্তবড়ো বিড়ম্বনা। বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানীদের পেছনে ঠেলে দিয়ে মঞ্চের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রাচ্যবিদদের বিশ্ব-সভায় সভাপতিত্ব করেন রাসায়নিক ও পেট্রোলিয়ম-মন্ত্রী। এবং এই প্রসঙ্গে দেখছি, আরেকটি বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে, এমন কি, বঙ্গেশ্বরেরও মুখ্য ভূমিকা। সরকারী পদমহিমায় আর রুলিং পার্টির বস্ হিসেবে এদেশে পঙ্গুও অবলীলাক্রমে বৈদগ্ধ্যের গিরি লঙ্ঘান।

কিন্তু উপায় কী। দায়ে পড়েই তো বাবা বলা। কারণ, এসব সরকারী কর্তাব্যক্তিদের যাঁরা এ ধরণের অনুষ্ঠানে খাতির করে নিয়ে আসেন, তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেনাদের শিল্পানুরাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তাই,

ব্যাপারটা বেশ একটু করুণ—এবং বিড়ম্বিত—হলেও, মনের ক্ষোভটুকু চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রদর্শনীটি দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি। প্রায় প্রত্যেকটি কাজেই একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আছে। আমাদের আজকের আর্টের ক্ষেত্রে যে অত্যন্ত বিরক্তিকর এক কৃত্রিমতা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা করছে, সেই ভঙ্গীসর্বস্বতা থেকে এখানকার শিক্ষার্থীরা মুক্ত বলে মনে হল। এটা এখানকার শিক্ষকদের সম্বন্ধে একটা বড়ো কথা। তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের রূপদৃষ্টি যাতে স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে, সেদিকে তাঁরা তাদের পরিচালিত করছেন; বস্তুরূপকে বাদ দিয়ে কলাকৈবল্যের নানা কিম্ভূত প্যাচ কষা প্র্যাক্‌টিস করতে তাদের বাধ্য করেন নি। এখানকার এই তরুণ শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি সহজ পথেই আত্মপ্রকাশিত। এই বাস্তবানুগ কাজগুলি দেখে আমরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত।

সাধারণ ভাবে, তেল-রঙের কাজগুলিই আমাদের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বলে মনে হয়েছে। অধিকাংশ কাজেই কম্পোজিশনের সৌকর্য সম্পর্কে শিল্পীর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। চিত্রিত বিষয়ের সংস্থাপন ও বিন্যাস সম্পর্কে এই সুষ্ঠু দৃষ্টির মূলে অবশ্যই আছে শিল্পীদের সুস্থ বাস্তববাদী মনোভাব। কিন্তু রঙের ব্যবহারে এগুলিতে এক ধরনের অনুজ্জ্বলতা ও স্বাদহীনতা লক্ষ্য করা গেল: নীল-সবুজ-ধূসরপ্রধান, বিপরীত টোন-বর্জিত, মৃদু, টানা রঙের কাজ।—এর একটি কারণ সম্ভবতঃ অধ্যক্ষ শ্রীসতীশ সিংহের প্রভাব; অন্য কারণ হতে পারে—ছাত্ররা যা বলেছেন—রঙ-"ব্যবসায়ীদের ফন্দিবাজি"র ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রদের অসুবিধে।

গ্র্যাফিক্‌স্ বিভাগের কাজগুলি এবং ভাস্কর্যগুলি ভালো। তেমনি দুর্বল কমার্শিয়ল বিভাগটি। কমার্শিয়ল আর্ট আজ এতো উন্নত হয়ে উঠেছে যে এই বিভাগে আরও কিছুটা মৌলিক কল্পনা আশা করেছিলাম। জলরঙের কাজগুলি আরেকটু বাছাই করলে দর্শকরা একটু কম ক্লান্তি বোধ করতেন।

কলকাতায় সোভিয়েত কলা-সমালোচক

কলকাতার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মহল ইদানিং প্রায়ই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট গুণীজনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন। এই জানুয়ারি

মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতিমধ্যে যে দুজন প্রখ্যাত সোভিয়েত নাগরিক কলকাতা ঘুরে গেছেন, তাঁদের একজন হলেন আজেরবাইজানের সুরকার সুলতান গাজীবেকফ—যিনি এখানে এসে বিশিষ্ট কয়েকজন গায়ক, যন্ত্রসংগীতশিল্পী ও সংগীত-ইতিহাসবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। অপর জন হলেন প্রবীণ কলা-সমালোচক ও শিল্প-ইতিহাসবিদ বোরিস ভ্লাদিমিরফ ভেইমার্ন।

ভেইমার্ন চারুকলার ইতিহাসবিদ ও প্রাচ্যশিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশ্বের নানা দেশে সুপরিচিত ও সম্মানিত। নিখিল-সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কর্তৃক সাত খণ্ডে প্রকাশিত বিরাট গ্রন্থ 'চারুকলার ইতিহাস'-এর তিনি অন্যতম সম্পাদক। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ আর্টস'-এর প্রাচ্য চারু ও কারুকলা বিভাগটি তিনিই সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে ভেইমার্ন নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের আর্ট রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটের সোভিয়েত জাতিসমূহের চারু ও কারুকলা বিভাগের প্রধান।

ভেইমার্ন জানালেন, প্রাচ্যকলার অনুরাগী হিসেবে ভারতে আসার জন্যে তাঁর যেমন দীর্ঘকালের বাসনা ছিল, তেমনি ভারতে আসার পর কলকাতায় আসার জন্যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। কারণ, এই কলকাতাই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মস্থান।

কিন্তু, দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতায় আমাদের আধুনিক চিত্রকরদের কিছু রচনা ও কয়েকটি প্রদর্শনীতে পশ্চিমী কিম্ভূত অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শনিজ্‌ম্ আর মডার্নিজম্-এর দিশেহারা নকলনবিশী দেখে, ভেইমার্ন বেশ একটু বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল। বারবার বললেন: বাস্তববাদী শিল্পই জীবনের সত্যগুলিকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে। শুধু চিত্রকলা নয়—যেকোনো মহৎ শিল্পকেই জীবনের বাস্তব সত্য থেকে রস আহরণ করতে হয়। বাস্তবতার গভীরেই মহৎ শিল্পের মূল প্রোথিত। আর, সেই জীবনসত্যকে বিকৃতরূপে উপস্থিত করে তথাকথিত বিমূর্তবাদ, আব্‌স্ট্র্যাক্‌শনিজ্‌ম্। কারণ, তা হল জগৎ আর জীবন সম্পর্কে শিল্পীর আত্মমুখী আর অস্বচ্ছ দৃষ্টিরই প্রতিক্রিয়া।

ভেইমার্নের এই কথাগুলি শুনে মনে হয়েছিল—আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের মডার্নিস্ট হিসেবে জাহির করার জন্যে তথাকথিত বিমূর্তবাদের চর্চা করছেন, তাঁদের অনেকেরই আদৌ কোনো জীবনদর্শনের বালাই নেই। অধিকাংশই এসব করছেন—কিছুটা ফ্যাশনের টানে; আরও বেশি, ট্যাঁস দৈনিক পত্রিকার হাত-তালি কুড়িয়ে ইওরোপে যাবার স্কলারশিপ জোগাড়ের

চেষ্টায় ; এবং, সবচেয়ে বেশি, স্টান্ট-সন্ধানী মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের পকেটের দিকে লক্ষ্য রেখে।—কিন্তু, কথাটা ভেইমার্নকে বলতে পারি নি। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে যে-বিদেশী এদেশে এসেছেন, তাঁকে একথা বলা চলে না।

ভেইমার্নও মনে করেন—কিছু সংখ্যক ভারতীয় শিল্পী পশ্চিম-ইওরোপীয় ও মার্কিন মডার্নিষ্টিক ফ্যাশনের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও, সেটা ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটা সাময়িক উপদ্রব। ভারতীয় চিত্রকলার যে মহৎ আর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, সেখান থেকেই ভারতীয় চিত্রকরদের প্রেরণা ও রস আহরণ করতে হবে। এবং যাঁরা তা করছেন, তাঁদের সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পাবে। পশ্চিমী বিমূর্তবাদ মানব-স্বরূপের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, মানুষের সত্য মূর্তিটিকে ভেঙেচুরে দিচ্ছে। তাই তা মানবতা-বিরোধী।

রবীন্দ্র মজুমদার

সং স্কৃ তি-সং বা দ

তাঁকে চেনা মনের একটি জয় : সপ্ততিতম জন্মদিনে বিজ্ঞানাচার্য

"যাঁকে চেনা মনের একটি জয়
মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে মন, ব্যাপ্তি যার সর্বদিকে,
শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, অথচ
প্রত্যহের জীবনসম্ভোগে—"

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব দেশবাসী উদ্‌যাপন করলেন ১৯৬৪-র ১লা জানুয়ারী, নতুন বছরের প্রথম তারিখটিতে। কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায় "যাঁকে চেনা মনের একটি জয়"—সেই বিজ্ঞানাচার্য বসুর মননের ব্যাপ্তিও তাঁরই "অতি মস্তিষ্কের জটিলতায়", অথচ যা তাঁরই আবার "আত্মভোলা, বেহিসাবী, নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদে"-ই সম্ভবে। তাঁর মনন, মানবিকতা আর হৃদয়বত্তার সেই বিরাট ও সমাহিত জগতের বাসিন্দা হতে শুধু বিজ্ঞানী নন, সাহিত্যকর্মীদেরও তাই অবারিত নিমন্ত্রণ থাকে।

এই 'পরিচয়' গোষ্ঠীরই একেবারে শুরু থেকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্যতম সহযোগিরূপে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাই বিজ্ঞানের জগত থেকে সাহিত্যের জগতে তাঁর "অগ্নিময় প্রতিভায়" স্বতই স্বচ্ছন্দবিহারী হন। সেদিনের কথাগুলি স্মরণ করেছেন সুধীন্দ্র-সত্যেন্দ্রেরই সতীর্থ-সহযোগী সেই 'পরিচয়' গোষ্ঠীর শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানাচার্য সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন। এই লেখাগুলি এবং 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের "বিজ্ঞানের সঙ্কট" প্রবন্ধটি পুনঃমুদ্রিত করে 'পরিচয়'-এর এই সংখ্যাটিতে আমরা বিজ্ঞানাচার্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সিদ্ধেশ্বর সেন

বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসব

ইংরেজী ১৯৬৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের বহু-খ্যাত আম্রকুঞ্জে যে বৎসর শেষের সমাবর্তন সুচারুভাবে সম্পন্ন হল—সেই বৎসরটি বিশ্বভারতীর অন্যথা মন্দগতি জীবনে বিশেষ কর্মচঞ্চলতার দাবি রাখে। শতবার্ষিকী উৎসবের পরবর্তী সরকারী ও বেসরকারী উদার অর্থমঞ্জুরী এবং সংযোগ-সমৃদ্ধ উপাচার্যের উদ্যোগের ফল এই বিশেষ বছরেই পাকতে শুরু করে। বহু নতুন বিভাগ সৃষ্টি, পুরাতন বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি মারফৎ এই এক বছরেই বিশ্বভারতীর শিক্ষক সংখ্যা শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন দালানবাড়ি তৈরিতে এই এক বছরেই অন্তত অর্ধকোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের নতুন গ্রেডে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এই এক বছরের মধ্যেই কার্যকরী হয়ে অনেক মাস্টারমশাই ও কর্মীকে ঘরবাড়ি তৈরিতে প্রেরণা দিয়েছে। গত বৎসর বিড়লার উদার অর্থে পুরনো শ্রীসদনের পাশাপাশি ছাত্রীদের জন্য যে নতুন 'ডিলাক্স' হোস্টেল খোলা হয়েছিল—তারই পাশে গোয়েঙ্কার দানে আরেকটি হোস্টেল উঠবে।

চীন-আক্রমণ পরবর্তী এই বৎসরে শান্তিনিকেতনে ন্যূনতম সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে। ন্যাশানল ক্যাডেট কোর জনবল ও অর্থবলে বহুগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে।

এবম্বিধ কর্মোদ্যোগের চাঞ্চল্য ছাড়াও এই বিশেষ বৎসর অন্যান্য কয়েকটি ঘটনা উপলক্ষ্যও স্মরণীয়। বোলপুর তথা শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের ছাত্রদের ডে-স্কলার হিসেবে বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভের সুযোগ বন্ধ করার কানুন এই বৎসরই কার্যত চালু হয়। পাঠভবন স্তরে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী মাধ্যম চালুও এই বৎসরেই। শ্রীনিকেতনে উচ্চপল্লী শিক্ষা কেন্দ্রে গোলোযোগ, পুলিশ হামলা, ছাত্র ও কর্মী গ্রেপ্তার—এসব ঘটনা এই আলোচ্য বৎসরেই।

এই বিশেষ কর্মোদ্যগে চিহ্নিত বৎসরের পটভূমিতে আচার্য নেহরু আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন প্রভাতে যখন ক্লান্ত অথচ গভীর স্বরে ক্রমপ্রসারমান টেকনোলজি ধারণ করার মতন উপযুক্ত 'ইডিওলজির' সন্ধান করেন—বিজ্ঞানের পরিপূরক মানবতাবোধ—আর সেই বিজ্ঞান ও টেকনোলজির পরিপূরক শক্তির চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীর কথা যখন উল্লেখ করেন, সঙ্কীর্ণ সমসাময়িকতার

উর্ধ্বেও কোথাও কোনোস্থানে সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক উপাদানে আগ্রহ, নিরলস চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীর কল্পনা যখন তাঁর ভাষণের প্রতিটি ছত্রে নিহিত থাকে তখন স্বভাবই প্রশ্ন জাগে।

বিশ্বভারতী কর্মোদ্যগের বর্তমান গতি ও চরিত্র এবং বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবধান কি আজ এমন পর্যায়ে পৌছয় নি যখন হয় বিশ্বভারতীর আদর্শের পুনর্বিচার করতে হবে নতুবা বর্তমান গতির মোড় ফেরাতে হবে ?

নেহরুর এ বৎসরের সমাবর্তন ভাষণ এক দার্শনিক স্তরের স্বগতোক্তি। বিশ্বভারতীর সমস্যায় তা আলোকপাত করে না। উপাচার্যের প্রতিবেদন বিশ্বভারতী পরিচালনা-সংক্রান্ত ক্লান্তিকর খুঁটিনাটিতে পরিপূর্ণ—বিশ্বভারতীর বর্ণহীন কর্মধারার এক প্রতিবেদন। প্রধান বক্তা শ্রীকোঠারির ভাষণের প্রথমাংশে আত্মন, ব্রহ্মণ, মন, বস্তু ইত্যাদি মৌলিক দার্শনিক বিষয় সম্পর্কে এক বিদগ্ধ আলোচনা (যদিও প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন ওঠে) এবং দ্বিতীয়াংশে বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'কেজো' কথা। ভারতের ক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যার অপরিসীম গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া উল্লেখযোগ্য। অন্য কারণে উল্লেখযোগ্য, এই প্রসঙ্গে চীনের নজির উপস্থিত করা।

এ বছরের সমাবর্তনের উল্লেখযোগ্য 'ঘটনার' মধ্যে অধ্যাপক কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ। ইতিপূর্বে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

এই বৎসরই চীনাভবনের অধ্যাপক শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লবোত্তর চীনের কবিতা সম্পর্কে এক নিবন্ধে পি. এইচ. ডি লাভ করেন।

সমাবর্তনের দীর্ঘাভ্যস্ত নিখুঁত আচাররীতি—মন্ত্রপাঠ, আলিম্পন, সপ্তপর্ণ দান, আম্রকুঞ্জের সেই বিশিষ্ট 'সেটিং'—এখনও অনাক্রান্ত, অক্ষত। বিশ্বভারতীর বিশিষ্টতার survival।

শান্তিনিকেতনে এবারের পৌষমেলা

৭ই পৌষ আরম্ভ হয়ে সরকারীভাবে তিনদিন এবং বেসরকারীভাবে আরও তিন-চারদিন গড়িয়ে যে মেলা শেষ হয় শান্তিনিকেতনের সেই মেলা ইতিমধ্যেই শহুরে বাঙালী সংস্কৃতিতে এক স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন অর্ধ-

শতাব্দী আগে এ ধরণের মেলার পরিকল্পনা করেন, তখন একদিকে যেমন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের শিল্পকে উৎসাহিত করার প্রশ্ন ছিল, অপরদিকে শহরের শিক্ষিতশ্রেণীকে গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে পরিচয় ঘটানোর ব্যাপার ছিল। শহর ও গ্রামের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে এই মেলার ভূমিকা কল্পনা করা হয়েছিল—একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না।

বাংলাদেশে আজ এমন কোনো মেলা তথা আনন্দকেন্দ্রে নেই যেখানে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার মতো সমাজের সর্ব স্তরের এত বিচিত্র সমাবেশ হয়। পাশের গ্রামগুলির থেকে আগত 'প্রাকৃত'জনদের সঙ্গে কলকাতার হালফ্যাসান দুরন্তদের কোনো প্রত্যক্ষ বিনিময় হয় না—এ স্বাভাবিক। তবু একই মেলার আনন্দের অংশগ্রহণকারী এরা। এর মূল্য যতটুকু ততটুকু উল্লেখ নিশ্চয়ই করতে হয়।

শিল্প বিপ্লবের সৃষ্টি ইওরোপের নগর জীবনে গ্রাম সময়ের বিচারে অনেকাংশে অতীত। পুঁজিবাদী নগরকেন্দ্রের লক্ষ্যহীন গতিবেগে ক্লান্ত সভ্যতা অনেক সময় পশ্চাদমুখী হয়ে গ্রামীণ মূল্যগুলির জন্য হাতড়ে বেড়ায়। অপর দিকে, বাংলা সংস্কৃতিতে কলকাতার উপস্থিতির পাশাপাশি গ্রাম বিশেষভাবে বর্তমান। এই বর্তমান গ্রাম নগর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে না—তার চেয়ে এক আধা-কল্পিত অতীত গ্রামের হাতছানি ইওরোপীয় নকলে ক্লান্ত কলকাতা সংস্কৃতিকে সাড়া দেয় অনেক বেশি। মেলায় দু-হাত দূরের জীবন্ত সাঁওতালের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় 'কুটির শিল্প'-জাত ফোক্ কালচার তথা ড্রয়িংরুম সজ্জা উপকরণের দোকানগুলিতে টাঙানো সাঁওতালের ছবি। আর ফোক্ রুচির প্রসারতার লক্ষণ—এ বছরের 'কুটির শিল্প'জাত দোকানের ব্যাপক সংখ্যায়। রুচির বহিরঙ্গ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। বাংলার শিক্ষিত শহরবাসীর এদিকে ঝোঁকের পেছনে একটা সৌন্দর্যবোধের গভীরতার লক্ষণ স্পষ্ট। বোম্বাই বা দিল্লীর সঙ্গে তুলনা করলে যা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু এহ বাহ্য।

'গ্রামীণ শিল্প' হিসেবে উপস্থিত এই পণ্যগুলি কদর পেলেও যথার্থ গ্রামের শিল্পের কি নিদর্শন মেলে এ মেলায়? শিল্পসম্ভার যদি আর্থিক জীবন ও মন এই দুয়েরই নির্দেশক হয় তবে আশেপাশের গ্রামগুলির দৈন্য—ব্যবহারিক ও আত্মিক দুই-ই—কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? সেই মান্ধাতার আমলের হাঁড়িকুড়ি হাতা খুন্তা, পাথরের বাসন—এর মধ্যে সামান্য হেরফেরও নেই। কাঠের দরজাপাল্লাও অপরিবর্তিত। তফাৎ শুধু আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপকতার। কোনো বছর বেশি, কোনো বছর কম। ধানের ফলন ও দরের সঙ্গে বাঁধা। নতুন ক্যানেল, ধানের অপেক্ষাকৃত ভালো দর—এই দুটি ঘটনা এ অঞ্চলে সওদা কিছুটা স্থির ভাবে বাড়িয়েছে। কিন্তু গ্রামে কুটিরশিল্পের চরম দৈন্যের শত চিহ্ন বহন করে এই পৌষের মেলা।

তবু শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা—এর মূল্য অনস্বীকার্য। বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের এক ছবি—এ মেলা তিনদিনের জন্য তুলে ধরে। মোটরগাড়ির সঙ্গে গরুর গাড়ির সাময়িক সহাবস্থান এ মেলা ঘটায়।

সওদা শেষে মাথায় প্লাষ্টিকের ফুল গোঁজা সাঁওতালী ও বাউড়ি মেয়ের দল খলখলিয়ে চলেছে। ফোক্ চিত্র ও টুকিটাকি সওদা করে আহ্লাদে আটখানা উঠছেন Busy Executive-এর bored স্ত্রী। দু-দিনের জন্য চাঙা বোধ হচ্ছে। ষ্ট হাট মাথায়, ছড়ি হাতে রাজধানী ও মফঃস্বল সহরগুলির মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা দুদিনের জন্য মনের সুখে কাপ্তানী করে নিচ্ছে।

শিল্পী, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ সবার কাছেই যার বহু মূল্য—তিনদিনের শান্তিনিকেতনের এই মেলা সে রকম এক খণ্ড ছবি তুলে ধরে।

নীলকান্ত গুপ্ত

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস

ভারতের রাজধানীতে এবারের প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়াটা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাঁরা অনেকদিন ধরে প্রাচ্য-বিদদের এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে যোগদান করে আসছেন তাঁদের মতে, আগের বারে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশ কংগ্রেসের পরে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এবারের এই ষড়বিংশ কংগ্রেসেই বিশ্বের প্রাচ্যবিদদের বৃহত্তম সমাবেশ ঘটেছিল—অন্তত প্রতিনিধি সংখ্যার দিক থেকে। ভারতে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার ফলে, স্বভাবতই ভারতবিদ্যা শাখার অধিবেশনগুলি হয়েছিল সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক। প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিনিধিদলেরই কোনো-না-কোনো সদস্য ভারতবিদ্যার কোনো-না-কোনো দিকের ওপর নতুন

আলোকপাত করেছেন। মিশরবিদ্যা ও চীনবিদ্যা বিভাগেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ পঠিত হয়েছে।

ভানু সেন

ঢাকায় সাংবাদিকদের শান্তি মিছিল

ঢাকা, ১৬ই জানুয়ারি—ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গতকাল সাংবাদিক, লেখক প্রভৃতি এক শান্তি মিছিল বাহির করেন। তাহা ছাড়া ঢাকার সংবাদপত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে সংযত থাকিবার জন্য আবেদন জানান।

(সংবাদ)

উভয় দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অধিবাসীদের নিকট আবেদন

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের উদ্দেশে একটি আবেদন লিপিতে কলিকাতার প্রায় দুই শত শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর দিয়েছেন।

আবেদনের কণ্ঠ যাঁরা তুলতে চেয়েছেন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন, গত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতায় কার্ফু ও যানবাহনের অচলাবস্থার মধ্যে তাঁদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

প্রায় দুইশত জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষরিত আবেদনটি নিম্নরূপ :

"গত দুই সপ্তাহ যাবৎ পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা মনে করি যে, যাহারা এই সমস্ত জঘন্য আচরণে লিপ্ত তাহাদের সহিত মানবতা, ধর্ম ও দেশাত্মবোধের কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা মনে করি, উভয় দেশের প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সক্রিয়ভাবে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারীকে অবিলম্বে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আমরা লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকর, অভিনয়শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও শিল্পব্রতীরা দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যে, তাঁহারা অবিলম্বে উভয় দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনুন এবং দুর্গতদের সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসুন।"

এই আবেদনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করিয়াছেন :—

অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আবদুল ওদুদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, ভবানী মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, অজিত দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল, গোপাল হালদার, লীলা মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, সমর সেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রাণতোষ ঘটক, সাগরময় ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, চিন্মোহন সেহানবীশ, অমিতাভ চৌধুরী, শঙ্কর, গৌরকিশোর ঘোষ, নিরঞ্জন মজুমদার, কৃষ্ণ ধর, নরেশ গুহ, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণাচল বসু, সুকুমার মিত্র, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, অমল দাশগুপ্ত, অরুণকুমার সরকার, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, আতাউর রহমান, ইবনে ইনাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ গুহ, কবিতা সিংহ, রাম বসু, প্রসূন বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অনিল সিংহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, উৎপলকুমার বসু, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, প্রণবরঞ্জন রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবেশ রায়, সুরজিৎ বসু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অসীম সোম, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, জ্যোতির্ময় দত্ত, দীপক মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কমলেশ চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, তারাপদ রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ কর, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, সমরেশ বসু, সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, অসীম রায়, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যেশ ঘোষ, চিত্ত ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সৈয়দ আবুল হুদা, রণজিৎ দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, শান্তিময় রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, যামিনী রায়, প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চুণী গোস্বামী, সতীশ সিংহ, গোপাল ঘোষ, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রভাস সেন, হৈমন্তী সেন, আলি আকবর খান, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,

সুখেন্দু গোস্বামী, সলিল চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অসিত সেন, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ও সি গাঙ্গুলী, রাজেন তরফদার, অজয় কর, তরুণ মজুমদার, নিতাই দত্ত, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, জহর রায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, কানন দেবী, অনুভা গুপ্তা, শর্মিলা ঠাকুর, তাপস সেন, সমীর ঘোষ, সরযূ দেবী, শম্ভু সাহা, সুনীল জানা, সুব্রত মিত্র, সুব্রত সেনশর্মা, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, সৌমেন্দু রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, এন বিশ্বনাথন, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অনুপকুমার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গুপ্ত, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ), নীরেন্দ্রনাথ রায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা প্রমুখ।